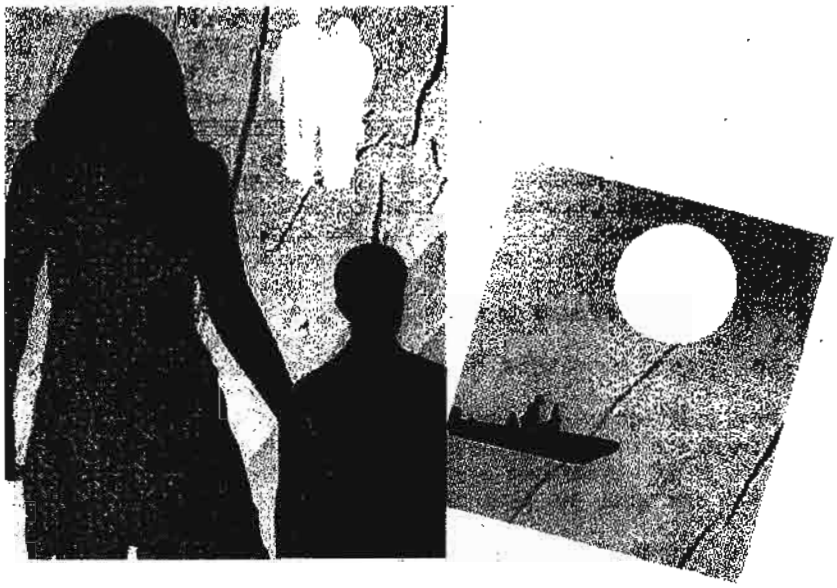

সচিত্রকরণ : ধ্রুব এষ

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত, দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর, সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও কোনো অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ-শিহরণ-ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ, চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।
আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

কাজী আনোয়ার হোসেন

রানা-সোহানা

রানা হাত বাড়ানোর আগেই হোঁ মেরে প্লেটের ওপর থেকে বিলটা তুলে নিলেন আদনান মুস্তফি। 'খবরদার! কারও কোনো জোরাজুরি শুনতে চাই না। এ বিল আমি দেব।'

'কিন্তু...'

'আবার কিন্তু!' কটমট করে সোহানার দিকে চাইলেন প্রফেসর। 'কী মনে করো তোমরা আমাদের? একেবারে খালি হাতে বেড়াতে বেরিয়েছি? জেসিকা, তোমার ব্যাগটা দাও তো এদিকে!'

হাসিমুখে হ্যান্ডব্যাগটা বাড়িয়ে দিল জেসিকা। 'হ্যাঁ, রোজ রোজ খাওয়ালে তো চলবে না, ভাই। আমাদেরও সুযোগ দিতে হবে। চেহারার বর্তমান অবস্থা কী, আদনান?'

'গুন্ডাটার মুখ ছাইবর্ণ, শুকনো ঠোঁট চাটছে; আর সোহানা ছুঁড়ির চেহারা হয়েছে বাংলার ৫-এর মতো। ওহ্-হো, ডার্লিং, তুমি তো ৫ কী রকম, তা জানো না। আঙুলটা দাও, আমি এঁকে দেখিয়ে দিচ্ছি।'

জেসিকার তর্জনী দু আঙুলে ধরে বোলেদর রেস্তোরাঁর ডাইনিং টেবিলের ওপর ৫ এঁকে দেখালেন প্রফেসর মুস্তফি। হেসে উঠল জেসিকা মুস্তফি। স্প্যানিশ মেয়ে ও, শৈশব থেকে অন্ধ। 'যাহ্! বাজে কথা। সোহানার অত সুন্দর চেহারা এ রকম হতেই পারে না।'

'আমার চেহারার বর্ণনা দিতে হবে না!' রাগ-রাগ ভাব করে চোখ রাঙাল সোহানা, 'এই এক ডিনারে তোমাদের অনেক টাকা বেরিয়ে যাবে, আদনান ভাই, সে খেয়াল আছে?'

'তোমাকে সেসব ভাবতে হবে না, বাছা,' বললেন অ্যাপ্লায়েড ফিজিক্সের আত্মভোলা প্রফেসর। রানার চেয়ে বছর আষ্টেকের বড়, সোহানার দূরসম্পর্কে ভাই হন। 'আমার আরও অনেক রোজগার আছে, তা জানো?'

জানে ওরা, কিন্তু কেউ মুখ খুলল না।

'তা ছাড়া এবার তো আমি রাজা! আমার ওই চুটকি বউ কী করেছে, শোনোনি? আমাকে কিচ্ছু না বলে কোথায় জানি লুকিয়ে বেশ কিছু ডলার পাচার করে এনেছে লন্ডন থেকে। প্লেনে ওঠার পর আমাকে জিজ্ঞেস করে : কিছু হবে?'

'জবাবে ও কী বলেছিল, সেটাও শুনে রাখো,' বলল জেসিকা। 'যদি ধরা পড়ি, ও নাকি কসম খেয়ে বলবে, চেনা তো দূরের কথা, জীবনে কোনো দিন দেখেইনি আমাকে। একেই তো বলে ভীতুর ডিম, তাই না?'

'বিচক্ষণ, বুঝলে,' সংশোধন করলেন পণ্ডিত, 'বিচক্ষণের ডিম।'

দক্ষিণ-পূর্ব ফ্রান্সের অনতিদূর অন্তরীপে রানা-সোহানার সঙ্গে এক সপ্তাহের জন্য বেড়াতে এসেছেন আদনান মুস্তফি ও তাঁর স্ত্রী, রানার চাপাচাপিতে উঠেছেন ওর ভাড়া করা ভিলার একাংশে।

বিল চুকিয়ে দিয়ে চোখ তুলেই ভুরু কুঁচকে ফেললেন প্রফেসর।

'আরে! ওই দেখো, তোমাদের সেই উন্মাদ প্লেবয়টা এই দিকেই আসছে।'

উত্তেজনায় সারাক্ষণ যেন টগবগ করে ফুটছে রিচি হাওয়ার্ড; বারের দিকে যাচ্ছিল, ওদের দেখে সামান্য দিক পরিবর্তন করে প্রায় লাফাতে লাফাতে ছুটে এল। বছর তিনেক হলো একে দেখা যাচ্ছে ভূমধ্যসাগরের তীরঘেঁষা বন্দরগুলোতে। হ্যান্ডসাম, সুবেশী, সুভাষী এবং ধনী—বয়স ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ। সুন্দর একটা ইয়টের মালিক। এই সব বন্দরনগরীর স্থানীয় অভিজাতদের সঙ্গে তো বটেই, নিয়মিত বেড়াতে আসা প্রায় সবার সঙ্গেই সখ্যের সম্পর্ক গড়ে নিয়েছে জনপ্রিয়, রসিক যুবক; বিশেষ করে মহিলাদের হৃদয়ের অনেকটা এলাকা দখল করে নিয়েছে একের পর এক বিলাসবহুল পার্টি দিয়ে। পাঁচ-ছয়টি ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারে, কোনটা যে তার মাতৃভাষা, বোঝা মুশকিল।

সব সময় রিচির সঙ্গে দেখা যায় লুকাস ম্যাকপিলকে। বেঁটে-খাটো, মোটা এই লোকের সঙ্গে চেহারা বা চালচলনে কোনো মিল নেই প্লেবয়ের। বয়স কমবেশি চল্লিশ, কিন্তু এই বয়সেই গোটা মাথায় একটা চুলও নেই ওর—একেবারে ফরসা। কথা কম বলে, ভাবলেশহীন চেহারায় হাসির কথায়ও হাসি ফোটে না। হাসিখুশি এক প্লেবয়ের সঙ্গে সারাক্ষণ এই লোক কেন, বোঝা যায় না। আচার-ব্যবহারে লোকটাকে রিচির কর্মচারী বা বডিগার্ড বলেও মনে হয় না। আবার বন্ধুও বলা যাবে না।

অবাক চোখে লোক দুজনকে দেখছেন প্রফেসর। দুদিন আগে এদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে সোহানার সুবাদে, তবে হ্যালো-হাই পর্যন্তই, তার বেশি কিছু না। রানা-সোহানার মধ্যে উচ্ছ্বাসের অভাব দেখে বুঝে নিয়েছেন, ওরাও খুব ভালো করে চেনে না এদের। তাহলে? এত উল্লাস কিসের? নাকি লোকটাই এমন?

'সোহানা, ডার্লিং!' খপ্ করে সোহানার একটা হাত ধরে ঝুঁকে চুমো দিল রিচি। 'দারুণ একটা আইডিয়া এসেছে আমার মাথায়! বুঝলে। চলো, আমরা বিয়ে করে ফেলি। আগামীকালই। রীতিমতো সবাইকে ডেকে, জাঁকজমকের সঙ্গে। ওহ্, দুর্দান্ত একটা ব্যাপার হবে! মারলিনের ক্যাপ্টেন হিসেবে ওখানেই সব ব্যবস্থা করব। রানা হবে আমার বেস্ট ম্যান, কনে সম্প্রদান করবেন প্রফেসর, ওঁর সুন্দরী স্ত্রী হবেন ব্রাইডসমেইড। কী মজা! শহরের সেরা প্রিস্টটাকে ধরে আনব। হানিমুন করব আমরা ইয়টে করে সারা দুনিয়া ঘুরে বেড়িয়ে। তুমি কী বলো, সুইট হার্ট?'

'আমি বলি, আর বিশটা বছর অপেক্ষা করো, রিচি, মাই বয়। আগে বিয়ের বয়স হোক তোমার।'

হা হা করে ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠল রিচি হাওয়ার্ড।

'এটা হয় না,' গম্ভীর মুখে বাগড়া দিল লুকাস, 'বিবাহিতা কেউ ব্রাইডসমেইড হতে পারেন না। মিসেস মুস্তফির পক্ষে কেবল মেট্রন অব অনার হওয়া সম্ভব।'

'সত্যি?' চোখ কপালে তুলল রিচি, 'তাহলে তো সব ভেস্তে গেল দেখছি! ঠিক আছে, কী আর করা! বিয়েটা নাহয় না-ই হলো, কাল রাতে আমার পার্টিতে এসো, তোমাদের সবার দাওয়াত। বন্দরের হোমরাচোমরা সবাইকে ডেকেছি! জমকালো পার্টি হবে কাল। একেবারে ফাটাফাটি! আসবে তো?'

মৃদু হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। 'তোমার সেই কোস্টা স্মেরাল্ডার পার্টির মতো না তো আবার?'

'আহ্-হা!' কপাল চাপড়াল রিচি, 'সেই ডাকাতি! কুত্তার বাচ্চারা কেড়ে নিল আমাদের সবকিছু!' মাথা নাড়ল এপাশ-ওপাশ, 'না, একই জায়গায় দ্বিতীয়বার হানা দেয় না ছিনতাইকারীরা। এ রকম রেকর্ড নেই। কাজেই যত খুশি সোনাদানা, জুয়েলারি, হিরে বসানো কাফলিংক, চুনি বসানো বোতাম, সোনার চেইন পরে আসতে পারো, কোনো ভয় নেই তোমাদের কারও। কাল ঠিক আটটায়। আসবে তো?'

'পরে জানাচ্ছি তোমাকে,' জবাব দিল সোহানা। 'আর, আমন্ত্রণের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।'

এতক্ষণে সোহানার হাত ছেড়ে দিল রিচি। 'লুকাস আর আমি বারে গিয়ে একটা ড্রিংক নেব। তোমরা এই পর্ব শেষ করে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলে খুবই খুশি হব।' কথা শেষ করে বারের দিকে ফিরল সে।

রওনা হওয়ার আগে রানা ও সোহানার দিকে ঝুঁকল লুকাস। বলল, 'পার্টির ভেন্যুটা জানেন? করোম্যান্ডেল, হুঁ। ফার ইস্টের কার্পেট, ড্রেপারি, ধূপ-ধুনো, তৈজস, ঢেউখেলানো কুঁচি দেওয়া পর্দা—ভাবতেই পারবেন না ফ্রান্সে আছেন, হুঁ। ছাদ-খোলা টেরেস লাউঞ্জ থেকে সাগর দেখা যাবে।' মাথা ঝুঁকিয়ে বাউ করে চলে গেল সে রিচির পিছু নিয়ে।

'ভেন্যু...' নিচু গলায় আপন মনে উচ্চারণ করলেন প্রফেসর। 'কী অদ্ভুত দ্ব্যর্থবোধক, আঠালো একটা শব্দ! যাকগে, এই দুজনকে কিন্তু পাশাপাশি মানাচ্ছে না, হুঁ।'

হেসে উঠল সবাই।

'রিচি হয়তো ওর বাড়াবাড়ি সামাল দেওয়ার জন্য এই লোকটাকে সঙ্গে রাখে,' বলল সোহানা।

'কোস্টা স্মেরাল্ডার পার্টিতে কী হয়েছিল?' জানতে চাইল জেসিকা। 'সত্যিই কোনো...'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'রিচির পার্টি থেকে ছিনতাই হয়ে গিয়েছিল সবার টাকা-পয়সা, রত্ন, অলংকার। এই একই দল আলাদা তিন জায়গায় একইভাবে আরও তিনটে ডাকাতি করেছে এ বছর। মুখোশ পরে আসে, ছয়-সাতজন, অস্ত্র উঁচিয়ে ছিনিয়ে নিয়ে যায় যার যা আছে। আট-দশ লাখ ডলারের অলংকার কেড়ে নিয়ে স্পিডবোটে করে হারিয়ে যায় সাগরে।'

'বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেনি কেউ?' বিভ্রান্ত দেখাল জেসিকাকে।

'করেছে। ওর ক্রুদের মধ্য থেকে একজন পালোয়ান কিসিমের লোক পাহারায় ছিল অঘটন ঠেকানোর জন্য। ঢোকার পথেই ডাকাতদের বাধা দিয়েছিল লোকটা। পায়ে গুলি করে তাকে অচল করে দিয়েছিল ওরা। আর কেউ কিছু করার সাহস পায়নি।'

'আমারও সাহস হতো না,' বললেন প্রফেসর। 'সবার আগে মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়াতাম। যাকগে,' সোহানার দিকে ফিরলেন তিনি, 'যদি রিচি লোকটার পার্টিতে যাওয়া হয়, তাহলে কারা যাবে, কী পরে যাবে, সেসব জেসিকাকে বুঝিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব কিন্তু তোমার। আমি ওসব একদম বুঝি না।'

হাসল সোহানা। বলল, 'ঠিক আছে। রানা?'

'আমি যাওয়ারই পক্ষে,' বলল রানা। 'পার্টি থ্রো করে কেউ যদি তার আনন্দের ভাগীদার করতে চায়, নেহাত অপারগ না হলে যাওয়াটাই ভদ্রতা। প্রত্যাখ্যান করা ঠিক হবে মনে করি না।'

'বেশ, তাহলে যাচ্ছি আমরা।'

খালি চেয়ার-টেবিলের ওপর একবার নজর বুলিয়ে শিরদাঁড়া খাড়া করলেন আদনান মুস্তফি। 'সবাই চলে গেছে। টেবিলক্লথ গোটাচ্ছে, আর মস্ত বড় বড় হাই তুলছে বেয়ারাগুলো। ইঙ্গিতটা যথেষ্ট সাউন্ড অ্যান্ড ক্লিয়ার মনে হচ্ছে না?'

'হ্যাঁ,' উঠে দাঁড়াল রানা। 'এবার কেটে পড়া উচিত। আদনান ভাই, তোমরা দুজন বেরিয়ে কার পার্কের দিকে হাঁটতে থাকো, আমি আর সোহানা বারে গিয়ে ইনভিটেশন অ্যাকসেপ্ট করে আসছি।'

'সবাই একসঙ্গে গেলে কী অসুবিধা?' জানতে চাইল জেসিকা।

'তাহলে আটকে দেবে,' বলল রানা, 'বার বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত বেরোতে পারব না আমরা কেউ। কী রকম নাছোড়বান্দা লোক দেখলে না? আমার হবু বউকে বিয়ে করে ফেলতে চায়! তোমরা গাড়ির দিকে রওনা হয়ে গেলে ছুতো দেখিয়ে বেরিয়ে আসতে

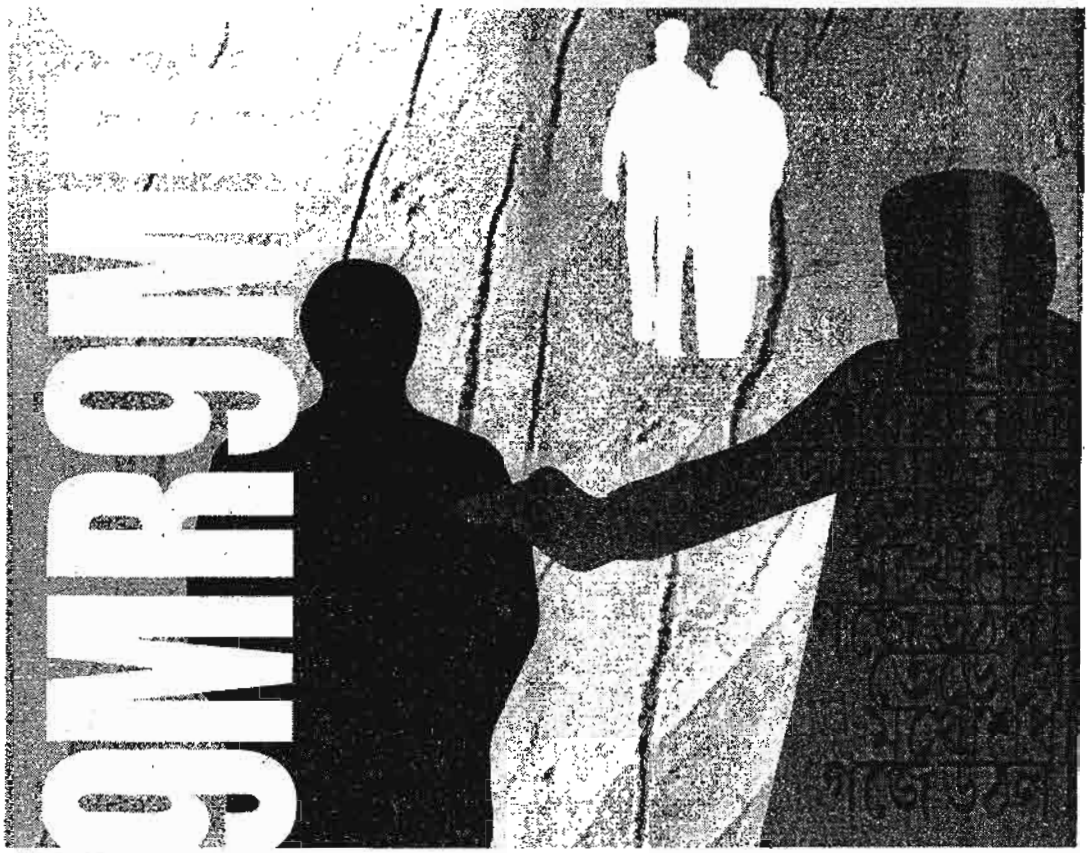

গর্জে উঠল রিভলবার

পারব, আটকাতে পারবে না।'

'ও, আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি,' বলে উঠে দাঁড়াল জেসিকা। ধীর পায়ে বেরিয়ে গেল স্বামীর হাত ধরে রেস্তোরাঁর ব্যাট উইং ঠেলে।

আবহাওয়াটা কেমন ভেজা-ভেজা, গরম; তাই সুতির একটা হালকা জ্যাকেট পরেছেন আদনান। বোলেদরের একপাশ দিয়ে আবছা আঁধার রাস্তা ধরে স্ত্রীকে নিয়ে চলেছেন পেছনের কার পার্কের দিকে। ভরপেট খেয়ে মৃদুমন্দ বাতাসে ফুরফুরে মেজাজে হাঁটছেন প্রফেসর, জেসিকার মুখের দিকে চেয়ে ওর ভেতরের আনন্দ টের পেলেন পরিষ্কার। পরমুহূর্তে খচ করে কাঁটা বিঁধল বুকে। এইবারই শেষ। আর কোনো দিন হয়তো এইভাবে ওকে নিয়ে বেড়াতে বের হওয়া সম্ভব হবে না। জেসিকাও আন্দাজ করেছে, ওদের পুঁজি শেষ হয়ে এসেছে। এরপর অন্ধকারের দিকে চেয়ে কাটবে ওদের নিরানন্দ দিন। আর কখনো জেসিকার মুখটা ঝলমল করে উঠবে না উচ্ছ্বাসে, আনন্দে। এখন একটু যেন অনুশোচনাই হচ্ছে।

নিজের ওপরই রাগ হলো ওঁর এসব ভাবছেন বলে। আত্মগ্লানি, আক্ষেপ ওঁকে অন্তত সাজে না—বেহিসাবি খরচ করেছেন তিনি ঠিক, কিন্তু সেটা ভালোবাসার জন্য, অন্তরের তাগিদে। জেসিকা যদি ওঁর মনের অবস্থা টের পেয়ে যায়, সব আনন্দ মাটি হয়ে যাবে বেচারির। ওকে আলতো করে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'কেমন লাগছে, ডার্লিং? ভালো?'

'খুব ভালো,' মাথা ঝাঁকাল জেসিকা। 'রানা-সোহানাকে আমার সব সময়ই ভালো লাগে। মনে হয়, মানুষকে আপন করে নিতে জানে ওরা—নিঃস্বার্থভাবে। ওদেরকে মনে হয় আত্মার আত্মীয়, তাই না?'

'সত্যি,' বললেন অ্যাবসেন্ট মাইন্ডেড প্রফেসর, 'এ রকম মানুষ হয় না। দুজন মিলেছে যেন সোনায় সোহাগা।'

'হ্যাঁ, আমাদের দুঃসময়ে যেভাবে ওরা পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল, অথচ একবিন্দু করুণা বিতরণ করেনি...' থেমে গেল জেসিকা, কারণ হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়েছেন আদনান, সারা শরীর শক্ত হয়ে গেছে।

'খোদা!' নিচু কণ্ঠে বলে উঠলেন আদনান, 'কী হচ্ছে ওখানে! ওদের থামাতে হবে। জেসিকা, তুমি রানাকে খবর দাও, জলদি!' কথাটা বলতে বলতে ওকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন তিনি, ওর পিঠে মৃদু ঠেলা দিয়ে বললেন, 'যাও...আমি দেখি...'

একটি কথাও না বলে দৌড় দিল জেসিকা, সামনে বাড়িয়ে রেখেছে হাত দুটো। শিস দেওয়ার ভঙ্গিতে ঠোঁট গোল করে হালকা এক ধরনের শব্দ করছে, শোনা যায় কি যায় না। সামনে কেউ বা কিছু থাকলে শব্দটা ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসবে, ধরা পড়বে ওর কানে। এ ছাড়া যে পথ ধরে এদিকে এসেছে, তার একটা সূক্ষ্ম ছাপ রয়ে গেছে ওর অনুভূতিতে, রেস্তোরাঁর দরজায় পৌঁছাতে পারবে অনায়াসে। ভেতরের ভয় চেপে রেখে প্রাণপণে দৌড়াচ্ছে জেসিকা, টের পেয়েছে, খুব খারাপ কিছু ঘটছে পার্কিং লটে। না-জানি এখন কী করছে আদনান!

দুটো গাড়ি দাঁড়িয়ে, রানার কনভার্টিবলের পাশেরটা খুব সম্ভব রিচি হাওয়ার্ডের। ওটার পাশেই একজন লোককে ধড়াস করে মাটিতে পড়তে দেখেছেন প্রফেসর। দেয়ালে লাগানো একটা বাতির আলোয় টাকটা ঝিলিক দিয়ে ওঠায় তাঁর মনে হয়েছে, লোকটা লুকাস ম্যাকফিল হতে পারে। কয়েক পা এগিয়েই টের পেলেন, আক্রমণকারী আসলে দুজন। হালকা-পাতলা লোকটা তামাশা দেখছে, আর তাগড়া লোকটা লাথির পর লাথি চালাচ্ছে মাটিতে পড়ে যাওয়া লোকটার গায়ে যত্রতত্র। মেরেই চলেছে।

এক মুহূর্ত দ্বিধা করলেন প্রফেসর। মারপিটের কোনো অভিজ্ঞতা নেই, তাই সব সময় চরম কিছু কল্পনায় ভেসে ওঠে। চামড়া ফুঁড়ে শরীরে ছোরা ঢুকছে, কিংবা বুলেট ছুটে এসে হাড়ের গায়ে হাতুড়ি পিটছে ভাবলেই তলপেট খামচে ধরে প্রচণ্ড ভয়। ভয় লাগছে তাঁর। কিন্তু পরিচিত একজন পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে দেখলে না এগিয়ে পারা যায় না—দৌড় দিলেন তিনি গাড়ির দিকে।

শেষ কয়েক গজ প্রায় উড়ে গেলেন আদনান। দাঁড়ানো লোকটা দেখতে পেয়ে সাবধান করল সঙ্গীকে, কিন্তু ততক্ষণে পৌঁছে গেছেন তিনি। হ্যাঁ, লুকাসই। রক্ত দেখতে পেলেন তিনি ওর নাকে-মুখে, শার্টে, কলারে। আরেক লাথি তুলেছিল তাগড়া জওয়ান লোকটা ধরাশায়ী লুকাসের উদ্দেশে, দড়াম করে একটা

লাথি হাঁকালেন তিনি ওর তলপেট লক্ষ্য করে।

বেকায়দা লাথি খেয়ে কেঁউ করে উঠল লোকটা, মাথা নিচু করে টলোমলো পায়ে ভারসাম্য রক্ষা করার চেষ্টা করছে। মাথাটা সহজ টার্গেট, কিন্তু রানার একটা কথা মনে পড়ল : প্রতিপক্ষের মাথায় ঘুষি মেরো না, হাড়ের সঙ্গে হাড়ের সংঘর্ষে বেশি ব্যথা পাবে তুমিই। ওসব কেবল টিভিতেই মানায়।

এক পা এগিয়ে জুডো চপ মেরে দিলেন তিনি লোকটার ঘাড়ের পাশে, তারপর বিস্মিত দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করলেন ফলাফলটা। দুই কদম পিছিয়ে পড়ে গেল সে, পতন ঠেকাল দুই হাতের তালু আর দুই পায়ের হাঁটু দিয়ে। আরেক লাথিতে স্রেফ শুয়ে পড়ল সে জ্ঞানহারা লুকাসের পাশে।

এইবার চোখ গেল তাঁর দ্বিতীয় দুর্বৃত্তের দিকে। এগিয়ে আসছে লোকটা, কোমর থেকে শরীরের ওপরের অংশ সামান্য ভাঁজ করে রেখেছে। আলো লেগে ঝিক করে উঠল ওর হাতে ধরা ছোরার ফলা। এবার ভয় নয়, নিখাদ আতঙ্কে জমে গেল প্রফেসরের কলজেটা। চমকে উঠেছে পেটের নাড়িভুঁড়িগুলো। দরদর করে ঘাম বেরিয়ে কুলকুল করে নামছে তাঁর বুক-পিঠ দিয়ে। কল্পনায় দেখতে পাচ্ছেন : তীক্ষ্ণধার ছোরাটা ভ্যাঁচ করে ঢুকে পড়েছে পাঁজরের ফাঁক গলে, এখন কচকচ করে কাটছে তাঁর লিভার, ফুসফুস ও হৃৎপিণ্ড। পা দুটো উসখুস করছে দৌড় দেওয়ার জন্য।

রানার আরেকটা মন্তব্য মনে এল : চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলে বা পালানোর চেষ্টা করলে ঘায়েল হয়ে যাবে প্রতিপক্ষের হাতে। কিন্তু পারো না-পারো, যদি একটু প্রতিরোধের ভঙ্গি নাও, তাহলে বলা যায় না, সে-ই হয়তো পিছিয়ে যাবে, কিংবা পালানোর চেষ্টা...

ডান হাত ঢুকে গেল জ্যাকেটের ভেতর, সড়াৎ করে সরু একটা শক্ত জিনিস বের করে আনলেন তিনি বুকের কাছ থেকে। মুঠোর ভেতর তীক্ষ্ণধার স্টিলেটোর মতো কিছু একটা দেখতে পেয়ে থমকে গেল আক্রমণকারী। তাঁকে পা দুটো সামান্য ভাঁজ করে একটু ঝুঁকে ওস্তাদ নাইফ-ফাইটারের ভঙ্গি নিতে দেখে কেটে পড়বে কি না ভাবল সে একবার।

এসব ভঙ্গি করতে গিয়ে লজ্জাই লাগছে প্রফেসরের, নিজের প্রতিটি ভঙ্গি দেখতে পাচ্ছে তাঁর নিরাসক্ত মন। ডান হাতটা আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে আগুপিছু করছেন, বীভৎস এক টুকরো হাসিতে বেরিয়ে পড়েছে দাঁত, একবার ডানে সরছেন, একবার বায়ে—কখন যে ছুরি চালাবেন, তার ঠিক নেই। প্রথমে একটু থমকে গেলেও আবার এক ইঞ্চি দুই ইঞ্চি করে সাবধানে এগোতে শুরু করল ছোরাধারী। সামনের তাগড়া লোকটাও নড়েচড়ে উঠে দাঁড়াচ্ছে এখন। হতাশায় ছেয়ে গেল তাঁর মন—এ যাত্রা রক্ষে নেই আর। বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কা কেটে যাচ্ছে দ্রুত, ধাপ্পা দিয়েও আর ঠেকানো যাবে না ওদের। আর কোনো কৌশল জানা নেই ওঁর।

পা দুটো আপনাআপনি ঝাঁকি খাচ্ছে, পালাতে চায়। লুকাসের কাছ থেকে কোনো সাহায্য আশা করা যায় না। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে ভয়ঙ্কর ভঙ্গিটা ধরে রাখাও মুশকিল হয়ে উঠেছে। অনেক কষ্টে ঘুরে দৌড় দেওয়া থেকে বিরত রেখেছেন নিজেকে। লুকাসকে এই অবস্থায় ফেলে যাওয়া যায় না। বীরপুরুষের অভিনয় করে যেতে হবে যতক্ষণ পারা যায়, তারপর যা থাকে কপালে।

পেছনে মৃদু খসখস শব্দ শুনে সচকিত হলেন আদনান। আরও লোক আছে নাকি! পরমুহূর্তে সামনের ছুরিওয়ালা লোকটার চোখে দেখতে পেলেন নিখাদ আতঙ্ক। কানের পাশে সোহানার কণ্ঠ শুনতে পেলেন, 'ঠিক আছে, আদনান ভাই। এবার একটু সরে দাঁড়াও দেখি।'

নিঃশব্দে ছায়ার মতো এগিয়ে এসেছে ওরা দুজন। লাফিয়ে ডিঙাল লুকাসের দেহটা, তাঁর দু পাশ দিয়ে এগিয়ে এল সামনে। সোহানা নিল ছোরাওয়ালার ভার, রানা উড়ে চলে গেল লম্বা-চওড়া গুন্ডাটার দিকে। কাঁপা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ঢিল করলেন প্রফেসর পেশিগুলো, শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে, কিন্তু কোনোমতে খাড়া রাখলেন নিজেকে।

দেখলেন, বিদ্যুৎ-বেগে ছোরা চালাল লোকটা। কোমরটা সামান্য বাঁকিয়ে অনায়াস ভঙ্গিতে আওতার বাইরে, এক পাশে সরে গেল সোহানা। ছোরাটা দুই ইঞ্চির জন্য ছুঁতে পারল না ওর বুকের খাঁচা। এইবার খোলা হাতে তালুর মাংসল জায়গাটা দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত হানল সোহানা লোকটার চিবুকের নিচে। ধাক্কার পেছনে দৌড়ের বেগ থাকায় জোর ঝাঁকি খেল লোকটার মাথা, মাটি ছেড়ে কয়েক ইঞ্চি ওপরে উঠে গেল পা, তারপর ধড়াস করে পড়ল চিত হয়ে। ছোরাটা ছিটকে চলে গেল কয়েক হাত দূরে।

ততক্ষণে পাশ ফিরে ঝুঁকে লুকাসের জখম পরীক্ষা করছে সোহানা। সেই ফাঁকে রানার দিকে চাইলেন প্রফেসর। বিশালদেহী লোকটার জন্য রীতিমতো দুঃখই হলো তাঁর। আগেই আবছাভাবে নজরে পড়েছে, রানা-সোহানাকে ছুটে আসতে দেখে সঙ্গীকে ফেলে পালানোর চেষ্টা করেছিল লোকটা, কিন্তু পেছন থেকে ওর কোট ধরে ফেলে রানা। দুই হাতে সমানে ঘুষি চালাচ্ছে এখন, কেঁপে কেঁপে উঠছে লোকটার শরীর। যখন নেতিয়ে পড়ল, তখন এক হাতে ওর কলার ধরে দেয়ালের সঙ্গে ঠেসে রেখে অন্য হাতে ধীরেসুস্থে সার্চ করল রানা ওকে। কোটের নিচে শোল্ডার হোলস্টার থেকে বের হলো একটা রিভলবার। কলারটা ছেড়ে দিতেই কাত হয়ে পড়ে গেল লোকটা মাটিতে; নড়ছে না, সম্ভবত জ্ঞান হারিয়েছে।

সোজা হয়ে প্রফেসরের দিকে ফিরল সোহানা। চোখে তাজ্জব হয়ে যাওয়া দৃষ্টি। 'আরে, আদনান ভাই, তুমি আবার কবে থেকে সঙ্গে চাকু রাখতে শুরু করলে?'

নিজের খুঠি করা হাতের দিকে চাইলেন আদনান, তারপর মুঠি খুলে দেখালেন বলপেনটা। 'কিছুক্ষণ ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা আর কি।'

হেসে উঠল সোহানা। 'কিন্তু দেখে তো মনে হচ্ছিল এক্সপার্ট নাইফ-ফাইটার! এই ভাবভঙ্গি কোত্থেকে শিখলে?'

'কোথায় আবার—টিভি থেকে!'

হেসে উঠল রানাও। বলল, 'দারুণ দেখিয়েছ কিন্তু, আদনান ভাই! এবার ভাবির কাছে যাও। দুশ্চিন্তায় মাথা খারাপ হয়ে গেছে বেচারির। আবোলতাবোল বকছিল।'

রওনা দিলেন আদনান, তবে মাঝামাঝি গিয়ে থামতে হলো। ড্রাইভওয়ে থেকে বাঁক ঘুরে দৌড়ে আসছে জেসিকা, পাশে দৌড়াচ্ছে রিচি হাওয়ার্ড, পেছনে দু-তিনজন বেয়ারা। দূর থেকেই উঁচু গলায় ডাকল জেসিকা, 'আদনান! সোহানা, ও ভালো আছে তো?'

'একটা আঁচড়ও লাগেনি,' জবাব দিলেন আদনান। স্বামীর গলা শুনে সামান্য দিক পরিবর্তন করে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল তাঁকে জেসিকা।

'কী ব্যাপার, কী হচ্ছে এখানে?' জিজ্ঞেস করল রিচি হাওয়ার্ড।

'দুজন লোক পিটিয়ে আধমরা করে ফেলেছে আপনার বন্ধু লুকাস ম্যাকপিলকে। সোহানার ধারণা, খুব বেশি জখম হননি ভদ্রলোক, আপনি দেখুন গিয়ে।'

রিচি দৌড় দিল গাড়ির দিকে, পিছু পিছু গেল তিন বেয়ারা। আদনানকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বুকে গাল রাখল জেসিকা, 'কী ঘটছে কিছুই বুঝিনি আমি, কিন্তু সেটা যে ভয়ানক কিছু, তা টের পেয়েছি তোমার ভয় দেখে।'

'ভয়?'

'হ্যাঁ। যখন তুমি থেমে দাঁড়িয়ে ওদের ডাকতে পাঠালে, তখন তোমার গায়ে ভয়ের গন্ধ পেয়েছি আমি।'

কথাটা শুনে আদনান অবাক হলেন না, বিরক্ত তো নয়ই। তিনি জানেন, জেসিকা বাস করে স্বাদ, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শের জগতে। অন্ধত্বের কারণে এই চারটি ইন্দ্রিয়ই ব্যবহার করতে হয়েছে বেশি বেশি, তাই অনুভবক্ষমতা অনেক বেড়ে গেছে এগুলোর। দেখা গেছে, জেসিকার ঘ্রাণশক্তি অনেক সময় কুকুরকেও হার মানিয়েছে।

'ওই গুন্ডাগুলো,' আবার বলল জেসিকা, 'তোমার...তোমার কি ওদের সঙ্গে মারামারি করতে হয়েছে?'

'সামান্য,' বললেন প্রফেসর। তারপর হেসে উঠলেন। 'দাঁড়াও, এক্ষুনি শুনতে চেয়ো না। একটু সময় পেলেই দেখবে মারপিটের কী রকম দুর্ধর্ষ কাহিনি দাঁড় করিয়ে ফেলি। আর, কটা দিন সুযোগ পেলে তো এমন বর্ণনা দেব, বিশ্বযুদ্ধের পর আমার এই মরণপণ যুদ্ধটাই দ্বিতীয় স্থান দখল করে নেবে ইতিহাসে। তবে তোমাকে চুপি চুপি বলছি : ফাইট হয়েছে, কিন্তু ছোঁয়াছুঁয়ি হয়নি। একটা বলপেন দিয়ে ঠেকিয়ে দিয়েছি ওদের ছোরা।'

'বলপেন দিয়ে?'

'এই জন্যই তো কথায় বলে : অসির চেয়ে মসি বড়।' সংক্ষেপে সব জানালেন তিনি স্ত্রীকে। 'সত্যি বলতে কি, ওদেরকে আমার ভালো বদমাশ মনে হয়নি—স্রেফ দুই নম্বর। অ্যামেচার। রানা-সোহানা পৌঁছে এক মিনিটেই ঠান্ডা করে দিয়েছে।'

'ওরা ঠিক আছে তো?'

উত্তর দেওয়ার আগেই রানার বেস্টলি কনভার্টিবল স্টার্ট নিল, হেডলাইট জ্বলে উঠল; তিন সেকেন্ডের মধ্যে এসে দাঁড়াল ওটা আদনান-জেসিকার পাশে।

'চলে এলে যে?'

'লুকাসের জ্ঞান ফিরে আসছে,' বলল সোহানা, 'এখন রিচি করবে যা করার। এখানে দেরি করলে ফ্রেঞ্চ পুলিশের খপ্পরে পড়ে যাব, স্টেটমেন্ট নিতে নিতে একেবারে বুড়ো করে ছেড়ে দেবে।'

পেছনের দরজা মেলে ধরলেন প্রফেসর জেসিকা উঠবে বলে, ঠিক তখনই লক্ষ করলেন, রানা-সোহানা কৌতুকের দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে মুচকি হাসছে। বিব্রত বোধ করলেন তিনি। 'দেখো!' তর্জনী তুলে শাসালেন তিনি, 'খবরদার, এ নিয়ে কোনো গল্প বানাবে না! দোহাই লাগে তোমাদের। পালিয়ে যে যাইনি, তার একমাত্র কারণ, পা দুটো বিট্রে করল, কিছুতেই নড়তে চাইল না।'

'বাজে কথা বোলো না,' ফুঁসে উঠল জেসিকা, 'ওরা ওকে লাথির পর লাথি মারছে দেখেও তুমি ছুটে গেছ সাহায্য করতে! এরপর তো চেষ্টা করেও নিজেকে খাটো করে দেখাতে পারবে না। আমার ধারণা, দুর্দান্ত সাহসের পরিচয় দিয়েছ তুমি, আদনান। তুলনাহীন!'

'শুধু তা-ই না,' বলল সোহানা, 'পাক্কা ছোরাবাজের পোজ নিয়ে নেকড়ের মতো দাঁত বের করে যে রকম চাপা গর্জন ছাড়ছিল—ভাগ্য ভালো যে দূর থেকে চিনতে পেরেছিলাম, তা নইলে তো আমরা দুজনই হার্টফেল করতাম।'

দুই

জামার পেছনে জিপার ফেঁসে যাওয়ায় ওটার সঙ্গে যুদ্ধ করছিল সোহানা, এমন সময় নক করে ওর ঘরে ঢুকল রানা। এগিয়ে এসে ওটা ছাড়িয়ে দিল, তারপর একটা ইজিচেয়ারে বসে আনমনে চেয়ে রইল সাগরের দিকে।

ড্রেস খুলে বাথরুমে ঢুকল সোহানা, দুই মিনিট পর বেরিয়ে এল গলা থেকে পা পর্যন্ত ঢাকা আকাশি নীল রঙের একটা ড্রেসিং গাউন পরে। রানাকে প্রশংসার দৃষ্টিতে চাইতে দেখে হাসল মৃদু হাসি। জিজ্ঞেস করল, 'কী ভাবছ, রানা?'

'এবার আদনান ভাইয়ের মধ্যে আগের সেই প্রাণবন্ত, উচ্ছল ভাবটা দেখছি না,' বলল রানা। 'কেমন যেন চুপচাপ মনমরা হয়ে গেছে হাসিখুশি মানুষটা। তুমি কিছু জানো?'

'আমিও লক্ষ করেছি,' চেয়ারের হাতলে বসল সোহানা, 'কী যেন নিভে গেছে মানুষটার ভেতর। কথায় কথায় জেসিকার কাছ থেকে একটু একটু করে বের করেছি আসল ঘটনা। ব্যাপার আর কিছু নয়—টাকা।'

'টাকা?' অবাক হলো রানা। 'টাকার অভাব তো ছিল না আদনান ভাইয়ের? শুনেছিলাম, ইউনিভার্সিটির বেতন তো আছেই, তার ওপর কয়েকটা পাঠ্যবই লিখেছেন; নিয়মিত ভালো টাকা আসে রয়্যালটি থেকে।'

'আসত,' বলল সোহানা, 'এখন আর আসে না। এখন মাসিক বেতনটাই একমাত্র উপার্জন। বিয়ের পর থেকে লেগে আছে আদনান ভাই জেসিকার অন্ধত্ব ঘোচানোর ব্যর্থ চেষ্টায়। কোথায় না গেছে ওকে নিয়ে। জার্মেনি, সুইডেন, জাপান, আমেরিকা, সাউথ আফ্রিকা, সিঙ্গাপুর...যেখান থেকে কেউ একটু আশ্বাস দিয়েছে, ছুটে গেছে সেখানেই। জেসিকার বাবাও অনেক চেষ্টা করেছিলেন, ফল হয়নি। অনেক বারণ করেছে জেসিকা। কিন্তু কারও কথা শুনবে না কিছুতেই। শেষমেশ আমেরিকার এক চক্ষু বিশেষজ্ঞর কথায় ওখানে নিয়ে গিয়ে একটা প্রাইভেট নার্সিং হোমে ভর্তি করে ছয় সপ্তাহ চিকিৎসা করিয়েছিল। দেড় মাসে বিশ হাজার ডলার খরচ করার পর তারা জানিয়ে দিল : কিছুই করার নেই, এ চোখ ভালো হওয়ার নয়।'

জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়াল রানা। 'মেয়েটাকে মনেপ্রাণে ভালোবাসে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সত্যি কি ফতুর হয়ে গেছে মানুষটা?'

'আমি যত দূর জানি, অনেক টাকা লোন নিয়েছিল ব্যাংক থেকে। রয়্যালটির সব টাকা চলে যাচ্ছে ইনস্টলমেন্ট শোধ করতে, আরও কয়েক বছর রয়্যালটির একটি পয়সাও ঘরে আসবে না। সারের বাড়িটাও যাবে বন্ধকের টাকা শোধ করতে না পারলে।' কাঁধ ঝাঁকাল সোহানা। 'জেসিকার নিজস্ব কোনো আয়-রোজগার বা জমানো টাকা নেই। ফলে ভালো গ্যাঁড়াকলেই ফেঁসেছে ওরা। সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার হচ্ছে, এই সবকিছুর জন্য জেসিকা দায়ী মনে করে নিজেকে।' একটু থেমে আবার বলল ও, 'এটা কী রকম ব্যাপার বলো তো, বন্ধু বা আপনজন, যাদের তুমি ভালোবাসো, তারা তোমার কাছ থেকে সব রকম সাহায্য নিতে প্রস্তুত, কিন্তু টাকা দিতে যাও—অপমান বোধ করবে! ওদের দেনা শোধ করে দেওয়া আমাদের জন্য কিছুই না, কিন্তু...'

'হ্যাঁ, কিন্তু,' মাথা নাড়ল রানা, 'আমরা কেউ যদি টাকা দিতে চাই, কিংবা সামান্য ইঙ্গিতও দিই, চিরতরে হারাব ওদের। থাকগে, ভেবো না। বিপদ আসে, আবার কীভাবে যেন কেটেও যায়।'

'কেটে গেলেই ভালো,' বলল সোহানা, 'আর্থিক দুরবস্থায় পড়লে মানুষের মন ছোট হয়ে যায়। আমরা দাওয়াত করে খাওয়ালে তারা যদি খাওয়াতে না পারে, আলগোছে কেটে পড়ে, হারিয়ে যায়। আমরা বন্ধু হারাই।'

মুখ কালো করে চুপচাপ বসে থাকল রানা কয়েক মুহূর্ত।

'ভালো কথা,' হঠাৎ প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল ও, 'আজ রাতে লুকাসের ব্যাপারটা তোমার কী মনে হলো?'

'কী মনে হলো মানে?' একটু অবাক হলো সোহানা, 'এ রকম তো হরহামেশাই হচ্ছে। বারে ঢুকে রিচি দেখল সিগারেট আনতে ভুলে গেছে, লুকাস গেল গাড়ি থেকে প্যাকেট আনতে; অমনি কবলে পড়ল ছিনতাইকারীর—এই রকম কিছু একটাই তো হবে।'

'কিন্তু ছিনতাই হয়নি কিছু। ওকে পেটানো হচ্ছিল। কেন?'

হাতের তালু দিয়ে চিবুক ঘষল সোহানা। 'তাই তো! আসলে অনুমান করার মতো যথেষ্ট তথ্য নেই আমাদের হাতে। খোঁজ নেওয়া দরকার মনে করছ?'

'না,' একটু যেন বেশি তাড়াতাড়ি জবাব এল, 'এটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। ভাবছিলাম... নিছক কৌতূহল।'

কয়েক সেকেন্ড রানার মুখের দিকে চেয়ে থাকল সোহানা। কিছু যেন আঁচ করতে চাইছে। রানা বিদায় নেওয়ার পর কেন যেন ওর মনটা ভালো হয়ে গেল। মনে হলো, একটা বোঝা নেমে গেছে ওর কাঁধ থেকে, আরেকটা বলিষ্ঠ কাঁধ সে ভার তুলে নিয়েছে। ওর আর চিন্তা না করলেও চলবে।

তিন

পরদিন দুপুর। বড়সড় পাওয়ারবোটের স্টার্নে বসে আছেন প্রফেসর আদনান। তাকিয়ে আছেন প্রায় দেড় শ ফুট লম্বা টো-রোপের দিকে। রশির শেষ প্রান্তে সাগর থেকে ষাট ফুট ওপরে উজ্জ্বল রোদে ঝলমল করছে বিশাল একটা ঘুড়ি।

ওখানে ট্রাপিজ বার দুহাতে আঁকড়ে ধরে ঝুলছে মাসুদ রানা, পায়ে স্নালোম স্কি। ওর পিঠে চড়ে উড়ছে জেসিকা—দুহাতে জড়িয়ে ধরে আছে রানার গলা। স্ত্রীর মুখটা দেখতে পাচ্ছেন আদনান রানার কাঁধের ওপর : নির্মল আনন্দে হাসছে জেসিকা, আগে কখনো এই অভিজ্ঞতা হয়নি ওর।

এক হাত তুলল রানা টো-রোপ রিলিজ গিয়ারের দিকে। তাঁকে উইঞ্চ ঘুরিয়ে আরও দড়ি ছাড়তে বলছে। আদনান দেখতে পাচ্ছেন, দুই পায়ে আরও জোরে রানার কোমর জড়িয়ে ধরল জেসিকা, তারপর একটা হাত নাড়ল তাঁর উদ্দেশে। প্রত্যুত্তরে হাত নাড়তে গিয়েও থেমে গেলেন আদনান, ভুলেই গিয়েছিলেন : জেসিকা দেখতে পাবে না।

এক হাতে বোটের হুইল ধরা, ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে রয়েছে সোহানা ঘুড়িটার দিকে—যেকোনো পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত। টো-রোপ ছাড়তে ছাড়তে গলা চড়িয়ে বললেন প্রফেসর, 'দেখো, দেখো! কী ফুর্তি! মহা আনন্দে রয়েছে এখন জেসিকা!'

'তুমিও চেষ্টা করে দেখো না, আদনান ভাই। মজা লাগবে। মনে হবে শ্যাম্পেনের নেশা!'

'তার চেয়ে এক বোতল ব্র্যান্ডি পেলে আরও বেশি খুশি হব,' বললেন প্রফেসর, 'এটা বিপজ্জনক মজা।'

সাঁ করে নেমে এল ঘুড়িটা পোর্ট সাইডে, রানার স্কি যখন পানি ছোঁয়-ছোঁয়, তখনই থ্রটল খুলে দিল সোহানা আরও। দুই সেকেন্ডে আশি ফুট ওপরে উঠে গেল ঘুড়িটা ডান দিকে, স্টারবোর্ড সাইডে।

থ্রটল কমিয়ে সোহানা বলল, 'বোতলে এই আনন্দ পাবে না, আদনান ভাই।'

আদনানের চোখ তখন অন্যদিকে। 'ওই দেখো, তোমার হবু বর রিচি হাওয়ার্ড আসছে এই দিকে!'

চট করে একবার ওর দিকে চেয়েই সিদ্ধান্ত নিল সোহানা : ঘুড়িটা নামিয়ে আনতে হবে। রিচি আর ঘুড়ি, দুটো একসঙ্গে সামলানো ওর পক্ষে সম্ভব নয়।

রানার দিকে একবার হাত নেড়ে স্পিড কমাল সোহানা। বোটের নাকটা এখনো বাতাসের দিকে তাক করা। ধীরে ধীরে নেমে এল ঘুড়ি। রানার স্কি সাগর স্পর্শ করল। কয়েক সেকেন্ড ভেসে থেকে ঝপাৎ করে পানিতে ডুবে গেল রানা জেসিকাকে পিঠে নিয়ে। সিলিন্ডারের মতো দেখতে দুটো ফ্লোট ভাসিয়ে রাখল ঘুড়িটাকে। পলিপ্রপিলিন টো-রোপ ভাসছে পানিতে।

রশি গুটিয়ে ঘুড়িটাকে কাছে নিয়ে এলেন আদনান, হাত বাড়িয়ে বোটে তুলে নিলেন জেসিকাকে। ঘুড়ির ফ্রেমটা ভাঁজ করতে ব্যস্ত রানা। রুদ্ধশ্বাসে বলল জেসিকা, 'আশ্চর্য! দারুণ! আমাকে দেখতে পেয়েছ, আদনান? মনে হচ্ছিল স্বর্গে চলে গেছি!' খুশি ও উত্তেজনায় লাল হয়ে গেছে ওর চেহারা।

দর্শনীয়ভাবে টার্নিং হল্ট করে বোট নিয়ে কাছে এগিয়ে এল রিচি। উজ্জ্বল হাসিমুখ আর ঝকঝকে চোখ তুলে চাইল সে সোহানার দিকে। 'লুকাস ম্যাকপিগের বার্তা এনেছি, সোহানা! তোমাদের সবার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে আমার বন্ধু। একটু সেরে উঠে ফুলটুল নিয়ে নিজেই দেখা করবে ও তোমাদের...'

'লোক দুজন কেন ওকে পেটাচ্ছিল পুলিশ বের করতে পেরেছে ওদের পেট থেকে?'

কাষ্ঠহাসি দিল রিচি। 'আর বোলো না! শুনলে রেগেই যাবে তোমরা। পালিয়েছে ওরা, পুলিশ আসার আগেই!'

'পালিয়েছে?' ভুরু জোড়া কুঁচকে গেল সোহানার।

'আমার গাড়িতে করে, আমারই দোষে, বিশ্বাস করো! রানার দেওয়া রিভলবারটা ওদের দিকে বাগিয়ে ধরে পুলিশের জন্য অপেক্ষা করছিলাম, হঠাৎ হাত থেকে পড়ে গেল ওটা।'

'পড়ে গেল! তামাশা করছ?'

'না, ঠাট্টা নয়। সিনেমার হিরোদের মতো মাঝে মাঝে ওটা শূন্যে ঘুরিয়ে খপ করে ধরছিলাম। শেষবার ফসকে গেল হাত থেকে। সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে তুলে নিল ওটা তাগড়া লোকটা।' মুখ বিকৃত করল রিচি। 'লজ্জার ব্যাপার! খেপে গিয়েছিল পুলিশ। ভয় পেয়েছিলাম, আমাকেই না আবার অ্যারেস্ট করে!'

'করলেও তোমার কিচ্ছু হতো না,' বলল রানা। ঘুড়ি ভাঁজ করে রেখে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। 'কোর্টে তোমার উকিল তোমাকে পাগল ডিক্লেয়ার করলেই বাধ্য হতো ছেড়ে দিতে।'

যেন খুব মজা পেয়েছে, এমন ভঙ্গিতে পেছনে হেলে হেসে উঠল রিচি, কিন্তু চোখে সে হাসির রেশ পৌঁছাল না। তারপর বলল, 'সত্যি, অবিশ্বাস্য একটা ঘটনা...ভাবা যায় না। যাকগে, এবার কাজের কথা।' সোহানার দিকে ফিরল সে, 'আমার পার্টির জৌলুস বাড়াতে তোমরা আসছ তো আজ?'

'হচ্ছে ওটা? বাতিল করোনি প্রোগ্রাম?'

'নাহ্, কী যে বলো! বন্দরের সেরা সুন্দরীদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। সেজেগুজে আসবে ওরা। চলে এসো, ম্লান করে দাও ওদের! কোনো ছুতো কিন্তু শুনব না।'

রানার দিকে চাইল সোহানা। উত্তরটা রানাই দিল।

'ঠিক আছে, আসছি আমরা। এবার তোমার ভটভটি নিয়ে একটু দূরে সরবে? কান ঝালাপালা হয়ে গেল!'

হাসিমুখে হাত নাড়ল রিচি, তারপর স্পিডবোট ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেল দূরে জেটিতে দাঁড়ানো মারলিনের দিকে।

চার

সন্ধের একটু পর জেসিকাকে সঙ্গে নিয়ে বৈঠকখানায় ঢুকলেন আদনান মুস্তফি। 'দেখো তো, সব ঠিকঠাক আছে কি না। আমি বললাম : লিপস্টিক, টিপ, সিঁথি, ক্লিপ, হুক—সব ঠিক আছে; কিন্তু আমার ওপর ভরসা নেই, আমি নাকি শাড়ির কিছুই বুঝি না, সোহানাকে দেখিয়ে সার্টিফিকেট পাওয়া গেলে তবে বুঝ মানবে!'

কলাপাতা-সবুজ একটা শাড়ি পরেছে জেসিকা। ফুটফুটে সুন্দর ফুলের মতো লাগছে ওর মুখটা। বলল, 'ও সব সময় বলে ঠিক আছে, ঠিক আছে—ভালো করে না দেখেই। একবার তো প্রাইস ট্যাগ আঁটা কাপড় পরে হাজির হয়েছিলাম এক পার্টিতে!'

ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে খুঁটিয়ে দেখল সোহানা জেসিকাকে। 'চমৎকার লাগছে,' আশ্বস্ত করল ও। 'তবে এত দামি একটা শাড়ির সঙ্গে ম্যাচিং জুয়েলারি দরকার—বিশেষ করে এই ধরনের সোশ্যাল পার্টিতে। সঙ্গে এনেছ কিছু?'

'না,' জবাব দিলেন প্রফেসর, 'আমরা পার্টির জন্য প্রস্তুত হয়ে আসিনি। বাড়িতে অবশ্য অপূর্বসুন্দর, ঝলমলে একটা হীরার ব্রোচ আছে ওর। কিনেছিলাম আলজিয়ার্সের এক খোঁড়া ফেরিওয়ালার কাছ থেকে। লোকটা কসম খেয়ে বলেছিল : কোনো সন্দেহ নেই, পাথরগুলো খাঁটি হীরা। যদি মিথ্যে বলে থাকে, তাহলে পানিতে গেছে আমার তিনটে ডলার।'

'আমি দু-একটা অলংকার ধার দিতে পারি,' বলে বেডরুমের দিকে হাঁটতে শুরু করল সোহানা। একবার গলায় হাত দিয়ে একটা ভুরু উঁচু করল রানার দিকে চেয়ে। মাথা সামান্য ঝাঁকিয়ে সম্মতি দিল রানা। সোহানা ফিরে এল চুনি বসানো দুটো চুড়, এক জোড়া ব্রেসলেট, একটা হিরে বসানো আংটি আর গলায় পরার জন্য অপূর্ব এক মুক্তার মালা। 'এই যে। রিচি যদি জমকালো পার্টি চায়, পাবে। জৌলুস চায়, তার চেয়েও অনেক বেশি পাবে এখানে। বিশ্বসুন্দরী এলেও জ্ঞান হারাবে জেসিকার কাছে নক-আউট পাঞ্চ খেয়ে।'

'ইয়াল্লা, না!' ছটফট করে উঠলেন প্রফেসর, 'ওগুলো না!'

'কী এগুলো?' মুক্তার ভারী নেকলেস হাতে নিয়েই আড়ষ্ট হয়ে গেল জেসিকা। ও চেনে এটা, এর ইতিহাস জানে; জানে পঞ্চাশ হাজার পাউন্ডে ইনশিওর করা আছে এই মালা। সোহানাকে উপহার দিয়েছিল রানা এই হার। একচল্লিশটা মুক্তা বসানো আছে এই নেকলেসে, সবচেয়ে বড়টার ওজন এক শ তেরো গ্রেইন, আর ছোটটার ত্রিশ গ্রেইন। এগুলো কাজের ফাঁকে ফাঁকে পৃথিবীর সাতটা বিখ্যাত পার্ল-বেড থেকে নিজে ডুব দিয়ে তুলেছে মাসুদ রানা সোহানার জন্য। সময় লেগেছে পাক্কা আড়াই বছর। পছন্দসই মুক্তোর জন্য বিশ হাজার ঝিনুক তুলতে হয়েছিল রানাকে।

'অসম্ভব!' রুদ্ধশ্বাসে বলল জেসিকা, 'এ আমি পরব না! মাই গড! এই জিনিস সঙ্গে রেখেছ কেন, সোহানা? ব্যাংকের ভল্টে রেখে দেওয়া উচিত এটাকে।'

'সেই জন্য তো দিইনি আমি ওটা,' বলল রানা হাসিমুখে, 'অলংকার পরার জন্য, ভালো লাগার জন্য—লুকিয়ে রাখার জন্য নয়। এবার ঘোরো তো, সোহানা পরিয়ে দিক গয়নাগুলো।'

মাঝরাতে পুরো জমে গেল রিচি হাওয়ার্ডের পার্টি। দীর্ঘ টেরেস রুমের এক পাশে স্টেজে বসেছে ব্যান্ডপার্টির পাঁচজন, চমৎকার বাজাচ্ছে জনপ্রিয় গান ও বাজনার সুর। স্যাক্সোফোনের মনছোঁয়া লম্বা টানে বুকের ভেতরটা কাঁপে, কেমন নেশা ধরে যায়। ঘরের তিন পাশের দেয়াল কুঁচি দেওয়া পর্দা দিয়ে ঢাকা, আগরবাতির গন্ধে প্রাচ্যের আবহ। বেশির ভাগ অতিথিই নাচছে, বিশ্রামের জন্য চেয়ারে বসছে, যার যে মদ পছন্দ, বোতল থেকে ঢেলে নিয়ে চুমুক দিচ্ছে গ্লাসে, গল্প করছে, তারপর আরেক পার্টনার বেছে নিয়ে চলে যাচ্ছে ডান্স ফ্লোরে। সোহানা, জেসিকা ও প্রফেসরও মহানন্দে নাচছে পার্টনার বদল করে করে। রিচি ছুটে বেড়াচ্ছে এদিক-ওদিক, হাসছে, কার কী দরকার, দেখাশোনা করছে, খাবারের তদারকি করছে; কখনো বা কোনো রূপসী মহিলার সঙ্গে নেচে নিচ্ছে কয়েক মিনিট। রানা একবার-দুবার নেচে একটু আলাদা হয়ে বসে আছে।

হঠাৎ বেতালা একটা ঝনঝনে, তীক্ষ্ণ আওয়াজে চমকে উঠল পার্টির সবাই। সিম্বল বা কাঁসির মতো শব্দ, তবে তার চেয়ে অনেক জোরালো। বাজনা থেমে গেল। অতিথিদের কলকণ্ঠ কয়েক সেকেন্ড শোরগোলের মতো শোনা গেল, তারপর চুপ হয়ে গেল সবাই।

ব্যান্ডপার্টির নিচু স্টেজে উঠে দাঁড়াল একজন লোক। হাঁটুর নিচ পর্যন্ত লম্বা কালো প্লাস্টিকের বর্ষাতি পরেছে, মাথাটা কালো হুড দিয়ে গলা পর্যন্ত ঢাকা। শ্বাস নেওয়ার জন্য ছোট একটা ফুটো থাকলেও চোখের জন্য আলাদা কোনো গর্ত নেই। সম্ভবত, ওটা এমন ফ্যাব্রিক দিয়ে তৈরি, যে ভেতর থেকে বাইরেটা দেখা যাবে, কিন্তু বাইরে থেকে ভেতরের কিছুই দেখা যাবে না। লোকটার হাতে ব্যারেল কাটা একটা দোনলা বন্দুক।

চারপাশে চোখ বুলিয়ে আরও তিনজন হুড পরা লোক দেখতে পেল রানা। দুজন টেরেস রুমের দুই দরজা, আর বাকিজন সিঁড়ির ল্যান্ডিং পাহারা দিচ্ছে। এদের প্রত্যেকের হাতেই কাটাবন্দুক। রিভলবার হাতে আরও তিনজন মুখোশ পরা মানুষ কামরার ভেতর

ঢুকছে দেখে সরে জায়গা ছেড়ে দিল অতিথিরা। দুজন মুখোশধারী দুই দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল, তৃতীয়জন টহল দেওয়ার ভঙ্গিতে চলে গেল কামরার শেষ মাথায়। কিছুক্ষণ চুপচাপ, তারপর ব্যান্ড স্টেজে দাঁড়ানো লোকটা ভাঙা-ভাঙা ফ্রেঞ্চে কথা বলে উঠল :

'মন দিয়ে শুনুন, প্লিজ। যা বলার একবারই বলব। কেউ নড়বেন না। একটু পর ওয়েটারদের একজন ট্রে হাতে এক এক করে আপনাদের সবার সামনে দিয়ে যাবে। সঙ্গে মূল্যবান যা কিছু আছে আপনারা সেই ট্রেতে রাখবেন। কেউ বাধা দিলে বা নির্দেশ অমান্য করলে মারাত্মক জখম হবেন।'

ব্যান্ডের দিকে ফিরে ইঙ্গিত করল লোকটা। কয়েক মুহূর্ত দ্বিধা করে বাজনা শুরু করল ওরা। অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে খালি হাত নাড়ল মুখোশধারী, ধমকের সুরে জোরে বাজানোর নির্দেশ দিল। বেড়ে গেল আওয়াজ।

দুই হাতে কপালের দুপাশ ধরে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে কী যেন বিড়বিড় করছে রিচি। হঠাৎ যেন মাথা খারাপ হয়ে গেল তার। তেড়ে গেল একজন মুখোশধারীর দিকে। গর্জে উঠল রিভলবার, কিন্তু বাজনার শব্দে প্রায় ঢাকা পড়ে গেল গুলির আওয়াজ। থমকে দাঁড়াল রিচি, ব্যথায় কুঁচকে গেছে মুখ। এক হাতে বাহু চেপে ধরে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল মেঝেতে, চোখেমুখে উদ্‌ভ্রান্ত, হতবিহ্বল একটা ভাব। তেমনই জোরেশোরে বাজছে বাজনা। নড়ল না কেউ।

ভীতসন্ত্রস্ত একজন ওয়েটারকে আঙুলের ইশারায় ডেকে তার হাতে ধরিয়ে দেওয়া হলো একটা খালি ট্রে। আদনান দেখলেন, কামরার মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে রানা ও সোহানা। সোহানা চেয়ে রয়েছে রানার দিকে। রানার চেহারা নির্বিকার। তাকিয়ে আছেন বলে টের পেলেন প্রফেসর, সামান্য একটু মাথা নেড়ে দামি টাইপিন ও কাফলিংক খোলায় মন দিল রানা। সোহানাও ওর এমারেল্ড ব্রোচ খুলতে শুরু করল।

ওদের থেকে সামান্য দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে জেসিকা। আদনান দেখলেন, দুধের মতো সাদা হয়ে গেছে ওর মুখ, দুই হাতে চেপে ধরে আছে গলার কাছটা। ধক করে উঠল তাঁর কলজেটা, রক্ত সরে গেল নিজের মুখ থেকেও। মনে পড়ে গেছে, সোহানার সেই অসম্ভব দামি মুক্তোর মালা এখন জেসিকার গলায়!

জেসিকার সামনে এখন ট্রে হাতে ওয়েটার। দেখলেন, মাসুদ রানা এগিয়ে গিয়ে আলগোছে ওর হাত দুটো সরিয়ে দিল গলার কাছ থেকে, হুক খুলে নেকলেসটা ছেড়ে দিল ট্রের ওপর। হীরার আংটি, রতনচূড় আর ব্রেসলেট জোড়াও গেল ওখানে। হতাশায় ছেয়ে গেল প্রফেসরের অন্তর। খানিক পরে নিজের শীর্ণ মানিব্যাগটা রাখলেন তিনি ট্রেতে, দেখলেন তাঁর চেনা অলংকারগুলো গড়াগড়ি খাচ্ছে আর সব মূল্যবান জুয়েলারির সঙ্গে।

অপারেশনের বিদায় পর্বও একই রকম নিপুণ দক্ষতায় সারা হলো। শটগান হাতে টেরেস লাউঞ্জের দরজায় দাঁড়াল দুজন, বাকি সবাই নেমে গেল সিঁড়ি বেয়ে নিচে, রাস্তাটা পেরোলেই ল্যান্ডিং স্টেজ। ইঞ্জিনের শব্দ কানে আসতেই দরজায় দাঁড়ানো দুজন অদৃশ্য হয়ে গেল। থেমে গেল বাজনা। সবাই একসঙ্গে কথা বলে উঠল। শোরগোলের শব্দ ছাপিয়ে কানে এল একটা শক্তিশালী বোটের আওয়াজ, দূরে সরে যাচ্ছে ক্রমে।

মেঝেতে হামাগুড়ি দিয়ে বসে আছে এখনো রিচি হাওয়ার্ড। মাথাটা ঝুলে পড়েছে নিচে, বাহু চেপে ধরা আঙুলের ফাঁক গলে টপটপ রক্ত পড়ছে মেঝেতে। রানা এসে দাঁড়াল ওর পাশে।

'আবারও...' যেন ঘোরের মধ্যে রয়েছে রিচি, মাথাটা নাড়ছে এপাশ-ওপাশ। 'হায় খোদা, সেই একই ঘটনা আবারও!'

'তোমার হাতটা দেখি, রিচি,' বলল রানা।

'আমার হাত? ও কিছু না...মাংস ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে গুলি।' প্যাগলাটে দৃষ্টিতে চারপাশে চাইল রিচি, তারপর টলোমলো পায়ে উঠে দাঁড়াল। 'এক ব্যাটা ডাক্তারকে দাওয়াত করেছিলাম, গেল কোথায়?' হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল সে, রাগে লাল হয়ে উঠল মুখটা। চড়া গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'আর ওই ম্যানেজার? কোথায় গেল হারামজাদা?' আরও চড়ে গেল গলা, 'আর অপদার্থ পুলিশগুলোই বা কোথায়?'

হাত খামচে ধরে লোকজনের ভিড় ঠেলে ছুটল সে সিঁড়ির দিকে। পেছন ফিরে রানা দেখল, ওর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে সোহানা। একটু দূরে দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপছে জেসিকা, এক হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে আছেন আদনান।

'চলো, এখান থেকে কেটে পড়া যাক,' বলল রানা।

'চলো,' ঘাড় কাত করল সোহানা, 'আমাদের স্টেটমেন্ট কাল দিলেও চলবে।'

রানা স্টিয়ারিংয়ে, পাশে বসেছে সোহানা; পেছনের সিটে জেসিকাকে জড়িয়ে ধরে বসে আছেন আদনান। কান্না থেমেছে, কিন্তু বেচারির কাঁপুনি যায়নি এখনো। ওর কথাটা বেরিয়ে এল আদনানের কণ্ঠ দিয়ে, 'ইস্‌স! মুক্তাগুলো!'

'আক্ষেপ কোরো না, আদনান ভাই,' বলল রানা, 'মেনে নাও। এটা কপালের ফের।'

'আমার গায়ে ছিল গয়নাগুলো!' ভাঙা গলায় বলল জেসিকা, 'আমি যদি ওগুলো না পরতাম—'

'আসলে আমিই তো জোর করে পরিয়েছি তোমাকে, তাই না?' সান্ত্বনা দিল সোহানা, 'তুমি না পরলে আমি পরতাম। এই একই ঘটনা ঘটত, জেসিকা। ওখানে কেউ আমরা যদি ট্যাঁ-ফোঁ করতাম, তাহলে শটগান দিয়ে ম্যাসাকার করত ওরা। যা ঘটেছে, তার জন্য সামান্য দায়দায়িত্বও তোমার ওপর বর্তায় না। আমরা সবাই ঘটনার শিকার, সেটা মেনে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।'

'তোমার কথা বুঝতে পারছি, সোহানা। কিন্তু মন মানতে চায় না। আমি একটা অপয়া। আমার যারা কাছের মানুষ, আপনজন; দেখেছি আমি, সব সময় তাদের ক্ষতি হয়।'

কথাগুলো মন খারাপ করে দিল সবার।

পাঁচ

পরের দুটো দিনে আদনান ধীরে ধীরে অনুভব করতে পারলেন, রানা-সোহানা যা বলেছে, তা বানোয়াট কিছু নয়। কী হারালাম, তা নিয়ে ভাবে না ওরা, সেটা অতীত—সময়টা খরচ হয়ে গেছে জীবন থেকে, আর কখনো ফিরে আসবে না। ভবিষ্যৎ নিয়েও বিন্দুমাত্র চিন্তিত নয় ওরা—সেটা আসেনি এখনো, নাও আসতে পারে কোনো দিন। ওরা বাঁচে বর্তমানে। এখন, এই মুহূর্তে। একটা একটা করে যে মুহূর্তগুলো আসছে সামনে, সেগুলো উপভোগ করতেই, সেগুলো ব্যবহার করে কিছু গড়ে তুলতেই ব্যগ্র।

কিন্তু জেসিকার আক্ষেপের শেষ নেই, কোনো সান্ত্বনাই শান্ত করতে পারছে না ওকে। সব দোষ নিজের ঘাড়ে চাপিয়ে নিয়ে অনুশোচনায় মিশে যাচ্ছে মাটির সঙ্গে। থেকে থেকে গাল বেয়ে নামছে পানি।

রিচি হাওয়ার্ডের সেই উচ্ছলতা নেই। টেলিফোন করে নিচু, লজ্জিত কণ্ঠে ক্ষমা প্রার্থনা করেছে ওদের কাছে। জানিয়েছে, ওর জখম সেরে উঠছে দ্রুত। কোনো শিরা বা রগে লাগেনি, মাংস ছিঁড়ে বেরিয়ে গেছে বুলেট।

যেমন ছিল, তেমনি হাসিখুশি রয়েছে রানা-সোহানা। সাঁতার কাটছে, মাছ ধরছে, বোটে করে ঘুরছে, ঘুড়িতে চড়ে উড়ছে—ছুটি কাটাচ্ছে মহানন্দে। ইনশিওরেন্স ক্লেইম করেই নিশ্চিন্ত। ডাকাতির ব্যাপারে আর কিছু ভাবতে রাজি নয়। তবে অনেক রাতে কোথায় যেন যায় মাসুদ রানা, ফিরে আসে ভোর হলে। কোথায় যায় জিজ্ঞেস করলে কিছু বলে না, হাসে।

তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় কিছু কেনাকাটার জন্য স্ত্রীকে নিয়ে মার্কেটে গিয়েছিলেন আদনান মুস্তফি, আধঘণ্টার মধ্যেই ফিরে এলেন হন্তদন্ত হয়ে। রানা বেরোচ্ছিল বাইরে, হাসিমুখে জিজ্ঞেস করল, 'কী হলো, আদনান ভাই? এত তাড়া কিসের?'

'ওখানে লুকাসের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল,' বললেন আদনান, 'বাজার করতে গিয়েছিল...'

'কী বাজার?' ভুরুজোড়া কুঁচকে গেল রানার।

'এই, খাবারদাবার, নিত্যপ্রয়োজনীয়...'

'খাবার কিনছে?' আবার কথার মাঝখানে জিজ্ঞেস করল রানা, 'বেশি বেশি করে?'

'হ্যাঁ। ইয়টের জন্য, কয়েক দিনের রসদ। দেখা হতেই এগিয়ে এসে ওর প্রাণ বাঁচানোর জন্য ধন্যবাদ জানাল আমাদের, পার্টিতে অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটে যাওয়ায় আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করল।' কনুই দিয়ে হালকা একটা গুঁতো মারলেন প্রফেসর জেসিকার পাঁজরে, 'এবার তুমি বলো, ডার্লিং।'

টগবগ করে ফুটছে যেন জেসিকা, অল্প অল্প কাঁপছে শরীরটা।

'ওই লোকটা ডাকাতির সময় উপস্থিত ছিল, সোহানা! আমার খুব কাছেই। তোমরা ওকে দেখেছিলে?'

রোদ পোহাচ্ছে রানা, হাতে পেপার

রানার দিকে একবার চেয়ে নিয়ে সোহানা বলল, 'না তো! আগের রাতে পিট্টি খেয়ে ও তখন বিছানায় শুয়ে কাতরাচ্ছে।'

'ভুল। আসলে মুখোশ পরে ওয়েটারের পেছন পেছন ঘুরছিল,' বলল জেসিকা, 'চোখ রাখছিল ট্রে থেকে কোনো অলংকার আবার খোয়া যায় কি না।'

'তুমি জানলে কী করে?' হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে।

'আগে জানতাম না, এই তো একটু আগে জানলাম,' বলল জেসিকা, 'গন্ধ। সেই ডাকাতের গায়ের গন্ধই পেলাম আমি আজ লুকাসের গায়ে।'

'তুমি শিওর?' জানতে চাইল সোহানা।

'শিওর। কিন্তু প্রমাণ করতে পারব না। তবে গন্ধ চিনতে ভুল হয় না আমার কখনো। আমি জানি, ও ছিল সেদিন ডাকাতির সময় ওয়েটারের ঠিক পাশেই।'

ভুল যে হয় না, সেটা ওরাও জানে। নিঃশব্দে ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ালেও জেসিকা টের পায় কে এসেছে। ও পৃথিবীটাকে অনুভব করে নাক-কান-জিভ ও স্পর্শের মাধ্যমে। প্রত্যেকের গায়ের গন্ধ সে আলাদাভাবে চেনে, তবে গন্ধকে যাতে গুলিয়ে না ফেলে, সে জন্য অন্য কিছুতে রূপান্তর করে নেয়। সোহানার গন্ধ ওর কাছে যেন মখমলের স্পর্শ, রানার গন্ধ আড়বাঁশির মতো, আদনানের গন্ধ নারকোল-চিংড়ির মতো।

'দারুণ, জেসিকা!' আন্তরিক প্রশংসা ঝরল রানার কণ্ঠে, 'দারুণ একটা তথ্য দিয়েছ! অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাকে। এইবার ধরা পড়বে ছিনতাইকারীরা।'

'কে ধরবে? পুলিশ?' অবাক হলেন আদনান, 'জেসিকার কথা ওরা বিশ্বাসই করবে না। পাত্তাও দেবে না।'

'তা তো দেবেই না,' বলল রানা, 'ওদের হাত-পা বাঁধা। হাতেনাতে ধরতে পারলে এক কথা, তা নইলে সলিড প্রমাণ চাই।'

'তাহলে?' হতাশ হয়ে পড়ল জেসিকা।

'নো চিন্তা, ডু ফুর্তি,' বলল রানা, 'এবার আমরা চারজন কাজে নামব। পানির মতো সহজ হয়ে গেছে এখন ব্যাপারটা। শাবাশ, জেসিকা! আমরাই এখন ধরে ফেলব ওদের।'

কথাটা শুনে ঝিকমিক করে উঠল জেসিকার দৃষ্টিহীন, নীল চোখ। যেন মুহূর্তে দূর হয়ে গেছে ওর সব কষ্ট।

'কীভাবে?' জিজ্ঞেস করলেন আদনান, 'চোর ধরা পুলিশের...'

'না। পুলিশ কিছু করতে পারবে না,' বলল রানা, 'ওদের আইন মেনে চলতে হয়। ব্যাপারটায় প্যাঁচ পড়ে গেছে মেলা। আমরা যেভাবে অনেক ছেঁড়া সুতো জোড়া দিয়ে খাপে খাপে মেলাতে পারছি, পুলিশের হাতে সে রকম কোনো তথ্য নেই। ওদের পক্ষে চোরাই মাল উদ্ধার করা সম্ভব হবে না।'

'তাহলে? আমাদের দ্বারা সম্ভব হবে?'

'দেখা যাক,' হাসল রানা, 'চেষ্টা তো করব। জেসিকার এই তথ্যটা পেয়ে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হয়ে গেলাম আমরা, কাজটা কাদের। এবার অ্যাকশনে যাব, লুটের মাল সব উদ্ধার করে ছাড়ব, ইনশাল্লাহ্। তবে, জেসিকা, তোমার সাহায্য লাগবে।'

'কী সাহায্য?' সাহায্য করতে এক পায়ে খাড়া জেসিকা, 'কী করতে হবে আমার?'

'আপাতত সোহানাকে টেবিলে খাবার সাজাতে সাহায্য করো। পেটটা ভরলে বুদ্ধি খুলবে, তখন বুঝতে পারব কোন পথে এগোতে হবে। তাই না, সোহানা?'

'চলো,' জেসিকার হাত ধরে রান্নাঘরের দিকে চলল সোহানা।

'এই না বেরোচ্ছিলে?' রানার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখলেন প্রফেসর, 'এখন আবার খিদে পেয়ে গেল! বাড়তি কী তথ্য আছে তোমার কাছে, একটু ঝেড়ে কাশো দেখি?'

'ছোট ছোট তথ্য, আদনান ভাই। কোস্টা স্মেরালডা। টেরেস রুম। সুন্দরী ছুকরিবিহীন প্লেবয় ইয়ট। লুকাসের মার খাওয়া। নায়কের মতো রিচির পয়েন্ট ফোরফাইভ রিভলবার লোফালুফি। বড়লোক মহিলাদের মধ্যে গয়নার প্রতিযোগিতা লাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা। বুলেটের আঁচড় খেয়ে রিচির মাটিতে আছড়ে পড়া। সব জায়গামতো বসছে না এখন?' হাসল রানা। 'রিচির ইয়টের ওপর চোখ রাখতে হবে। খাওয়া সেরে সারা রাতের জন্য বেরোব আজ।'

'কদিন ধরে এই কাজই করছ বুঝি? তোমার সঙ্গে আমিও যাব আজ।'

'একসঙ্গে দুজন কষ্ট করে লাভ নেই, আদনান ভাই,' বলল রানা, 'তুমি বরং দুটোর পর থেকে ডিউটি দাও। ঠিক রাত দুটোয় জেটির পুব দিকে বাতিহীন ল্যাম্পপোস্টটার নিচে দেখা কোরো আমার সঙ্গে। ঠিক আছে?'

'না, ঠিক নেই,' বললেন প্রফেসর, 'আমি টিচার মানুষ, রাত জেগে অভ্যেস আছে। আমি নেব প্রথম রাতের ডিউটি, তুমি

খানিক ঘুমিয়ে নিয়ে তারপর এসো রাত দুটোয়।'

রাত ঠিক নয়টায় ফোন এল আদনানের। কণ্ঠে উদ্বেগ।

'রানা কোথায়?'

'ঘুমাচ্ছে,' জবাব দিল সোহানা, 'কেন, আদনান ভাই?'

'নোঙর তুলে ফেলেছে। বন্দর ছাড়ছে মারলিন!'

'তাই নাকি? ঠিক আছে। সম্ভব হলে কোন দিকে যাচ্ছে দেখেই ফিরে এসো।'

বিশ মিনিট পর ফিরে এসে রানাকে বারান্দায় পেলেন আদনান। ওঁরই জন্য অপেক্ষা করছে। ওয়েট-সুট পরেছে রানা, মাথায় কালো নিওপ্রিনের হুড। বাড়ির সব বাতি নেভানো। 'পুব-দক্ষিণে যাচ্ছে ওরা,' বললেন তিনি চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে, 'মনে হয়, মার্সেইর দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই এই ভিলার পেছন দিয়ে যাবে। আর সবাই কোথায়?'

'বোট হাউসে,' বলল রানা, 'চলো যাই।'

একটা ওয়াটারপ্রুফ জ্যাকেট বাড়িয়ে দিল ও তাঁর দিকে। ঝটপট ওটা পরে নিলেন প্রফেসর। লম্বা পা ফেলে চলে এল ওরা বোট হাউসে। মাইল খানেক দূর দিয়ে ঝলমলে আলো জ্বেলে চলে যাচ্ছে রিচি হাওয়ার্ডের ইয়ট।

'যেদিক খুশি চলে যাবে এবার!' বললেন আদনান।

'সে জন্যই ওটাকে চোখের আড়াল করতে চাইছি না,' বলল সোহানা। রওনা হওয়ার জন্য সবকিছু রেডি করে বসে আছে ও। ওয়াটারপ্রুফ জ্যাকেট পরেছে সোহানা ও জেসিকা। 'গরম কাপড়ের অভাব নেই,' পাওয়ারবোটের ইঞ্জিন চালু করে আবার বলল ও, 'কারও শীত লাগলে লকার খুলে বের করে নেবে। ঠিক আছে?'

রানার পরনে ভিন্ন পোশাক কেন বুঝতে পারলেন না আদনান। সাগরের তীর ঘেঁষে চলছে পাওয়ারবোট, স্পিড বাড়ছে ক্রমে। দূরে মিটমিট করছে মারলিনের আলো। মাঝে মাঝে হুইলটা অটোতে দিয়ে শক্তিশালী বিনকিউলার চোখে তুলে দেখছে সোহানা ওটাকে। ওর হাবেভাবে বুঝতে পারলেন এক্ষুনি ইয়টের বেশি কাছে যেতে চাইছে না সোহানা। সমান স্পিডে দূর থেকে অনুসরণ করতে চাইছে কেবল। মনে হয়, গভীর রাতে কাছে ভিড়তে চায়। কিন্তু তারপর কী হবে, আন্দাজ করতে পারছেন না। কেউ কিছু বলছেও না।

'বুঝলাম, মারলিনের টপস্পিড বিশ নট,' বললেন তিনি শেষ পর্যন্ত, 'পাওয়ারবোট নিয়ে ওটাকে ধরা কোনো ব্যাপার নয়। কিন্তু তারপর, সোহানা? কাছেই তো যেতে পারব না ওটার, দেখে বা শুনে ফেলবে। তা ছাড়া ওদের কাছে অস্ত্র আছে। আর যদি ওদের অজান্তে কাছে যেতে পারিও, ওপরে উঠব কী করে? ঘাসফড়িং হলে নাহয় এক কথা ছিল, লাফ দিয়ে উঠে পড়তাম। ইয়টে চড়াই যদি না যায়, খামোখা ওর পিছু ধাওয়া করে লাভ কী?'

'আমরা ওটার এতটা কাছে যাব না, যাতে দেখতে বা শুনতে পায়,' বলল সোহানা, 'চিন্তা কোরো না, আদনান ভাই। চাঁদটা ডুবলেই আমরা কিছুটা কাছে যাব, এই বোটের আওয়াজও খুব কম, তা ছাড়া আজ কালো ঘুড়িটা ব্যবহার করবে রানা।'

ঘুড়ি? এই রাতের বেলা? এমনিতেই শীত, সোহানার কথা শুনে হাত-পা আরও ঠান্ডা হয়ে এল প্রফেসরের। আঁধার সয়ে এসেছে চোখে, পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন, পাওয়ারবোটের এক পাশে হালকা ডিউর‍্যালিউমিনের তৈরি ঘুড়ির কাঠামোটা বাঁধা রয়েছে। রানার বিশেষ পোশাকের অর্থও বুঝতে পারলেন এতক্ষণে।

'পাগল হয়ে গেছ তোমরা!' বললেন তিনি, 'এ অসম্ভব!' রানার দিকে ফিরলেন তিনি কিছু বলবেন বলে, কিন্তু তার আগেই পেয়ে গেলেন উত্তর।

'আজই রাতে আমি সবাইকে নিয়ে মারলিনে উঠব বলে ঠিক করেছিলাম,' স্টার্নের উইঞ্চটা পরীক্ষা করছিল এতক্ষণ, ফিরে এসে বলল রানা। 'জেটিতে পেলে সবাই একসঙ্গে যেতে পারতাম, কিন্তু চলন্ত অবস্থায় প্রথমে একজনকে পৌঁছাতে হবে ইয়টে—এইটুকুই তফাত। চেয়ে দেখো : ঢেউ নেই বললেই চলে, টেক-অফ করতে কোনো অসুবিধে নেই; বাতাসটাও চমৎকার—ঠিক যেমনটি দরকার, এক ভাবে বইছে; ফলে কম স্পিডে ফ্লাই করতে পারব। লম্বা টো-লাইন থাকবে, যার ফলে ইয়ট থেকে অনেক দূরে থাকতে পারবে সোহানা।'

'লম্বা...মানে, কতটা লম্বা?'

জবাব দিল জেসিকা। 'সোহানা তো বলছে সাত-আট শ ফুট।'

'কী বললে?'

'ঘাবড়াও মাত, আদনান ভাই। কিছুদিন আগে এক অস্ট্রেলিয়ান দুই হাজার ফুট টোর সাহায্যে এক হাজার ফুট ওপরে উড়েছে। সেটা অবশ্য দিনে। কিন্তু আমাদের তো আবার আঁধার দরকার। আর আজকের রাতটাও এ কাজের জন্য চমৎকার।'

'ঘাড় মটকানোর জন্য চমৎকার!' বললেন প্রফেসর, 'কী বলো তুমি! পাকা হাতে বোট সামলাতে হবে, সোহানার হাত অবশ্য ঠিকই আছে, কিন্তু ও তো তোমাকে দেখতেই পাবে না, ডান-বাঁ করবে কীভাবে?'

'আমার সঙ্গে একটা থ্রোট-মাইক থাকবে, সোহানার হেডসেটে থাকবে রিসিভার,' আশ্বস্ত করল রানা। 'কাজেই কোনো অসুবিধে হওয়ার কারণ দেখি না। আমাকে না দেখলেও চলবে, আমিই জানিয়ে দেব কখন কী চাই। আপনাদের অ্যাপ্লায়েড ফিজিক্সে কী বলে—সম্ভব নয়?'

তর্ক করা বৃথা, টের পেয়ে চুপ হয়ে গেলেন প্রফেসর। সবার মুখ ভিজে যাচ্ছে সূক্ষ্ম জলকণা লেগে, একটু পর পর মুছতে হচ্ছে রুমাল দিয়ে। মাঝরাতের দিকে গতি বাড়াল সোহানা।

আরও দুঘণ্টা পর মারলিনকে পাশ কাটিয়ে বেশ কিছুটা এগিয়ে গিয়ে থামল পাওয়ারবোট। ঘুড়ির কাঠামো জোড়া দিয়ে ইতিমধ্যে তৈরি হয়ে নিয়েছে রানা। পশ্চিম আকাশের সরু চাঁদের তির্যক আলোয় আরও কালো দেখাচ্ছে ভূমধ্যসাগর। মাইল তিনেক পেছনে রয়েছে মারলিন। সব বাতি নিভিয়ে এখন শুধু নেভিগেশন লাইট জ্বেলে এগিয়ে আসছে।

গগলস পরে নিয়ে বোটের কিনার থেকে নেমে গেল রানা পানিতে। সোহানার নির্দেশে টেরিলিনের পালটা খুলে দিলেন আদনান। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঘুড়ি ভেসে উঠল বোটের পেছনে। পালের নিচে ঝুলন্ত বারটা ধরল রানা। আসল কাজ শুরুর আগে একটু প্র্যাকটিস করে দেখে নেবে সবকিছু ঠিকমতো কাজ করছে কি না। ঘুড়িতে বা যোগাযোগব্যবস্থায় অসুবিধা না থাকলে হারনেস খুলে ফেলবে রানা, ট্রাপিজ বারে ঝুলে থাকবে। রানার নির্দেশ পেলে চলন্ত মারলিনের এক-দেড় শ গজ কাছে চলে যাবে সোহানা বোট নিয়ে। ইয়টের কোর্সের সঙ্গে চল্লিশ ডিগ্রি কোণ করে পাওয়ারবোট বাতাসের বিপরীতে চলবে, যাতে নামতে পারে রানা ইয়টের ডেকে।

মহড়া দেওয়ার জন্য চলতে শুরু করল পাওয়ারবোট। খানিক পরেই পাশ দিয়ে এগিয়ে গেল মারলিন। নেভিগেশন লাইট ছাড়াও হুইলহাউসে আবছা আলো দেখা গেল। এক বা দুজন লোক থাকবে হয়তো হুইলহাউসে, তবে তাদের পেছন ফিরে তাকানোর সম্ভাবনা খুবই কম।

পাওয়ারবোটের পেছনে প্রায় চল্লিশ ফুট ওপরে উঠে গেছে ঘুড়িটা, দেখা যায় কি যায় না। রিসিভারে কিছু নির্দেশ এল, থ্রটল আরও খুলে দিল সোহানা। স্লালোম স্কি পরা রানাকে এখন ছায়ার মতো আবছা দেখা যাচ্ছে। কিছুদূর স্কি করে এগোনোর পর সারফেস ছেড়ে উঠে পড়ল ও শূন্যে।

সোহানা চেঁচিয়ে বলল, 'রশি ছাড়ো!'

উইঞ্চ কন্ট্রোলের হাতল চেপে ধরলেন প্রফেসর, আস্তে আস্তে ছাড়তে শুরু করলেন টো-লাইন। কী ঘটছে জানার জন্য অস্থির হয়ে রয়েছে জেসিকা, কিন্তু স্থির হয়ে বসে আছে মূর্তির মতো—কথা বললে পাছে সোহানা বা আদনানের মনোযোগ ছুটে গিয়ে কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যায়!

পাওয়ারবোটের দুই শ গজ পেছনে সাগর থেকে দেড় শ ফুট ওপরে উঠে পড়েছে রানা। বরফের মতো ঠান্ডা হয়ে গেছে ওর মুখ, কিন্তু ওয়েট-সুটের ভেতর শরীরটা গরম।

'বাঁ দিকে স্লালোম করব এবার, সোহানা,' বলল ও থ্রোট-মাইকে, 'শুরু করলাম।'

বার ধরা হাত সরিয়ে শরীরের ওজন খানিকটা বাঁয়ে চাপাল রানা। বাঁ দিকে গোত্তা খেয়ে নামতে শুরু করল বিশাল ঘুড়ি। স্কি জোড়া যখন পানির একেবারে কাছে চলে এল, তখন ডানে চাপাল ওজন, মুখে বলল, 'ওপরে!' রানাকে নিয়ে এবার উঠতে শুরু করল ঘুড়ি, সেই সঙ্গে সরে যাচ্ছে ডানে। এই রকম বার কয়েক এদিক-ওদিক করে একটা আন্দাজ এসে গেল ওর দূরত্ব ও হাওয়ার গতি সম্পর্কে। বলল, 'ঠিক আছে, সোহানা। এইবার এগোও।'

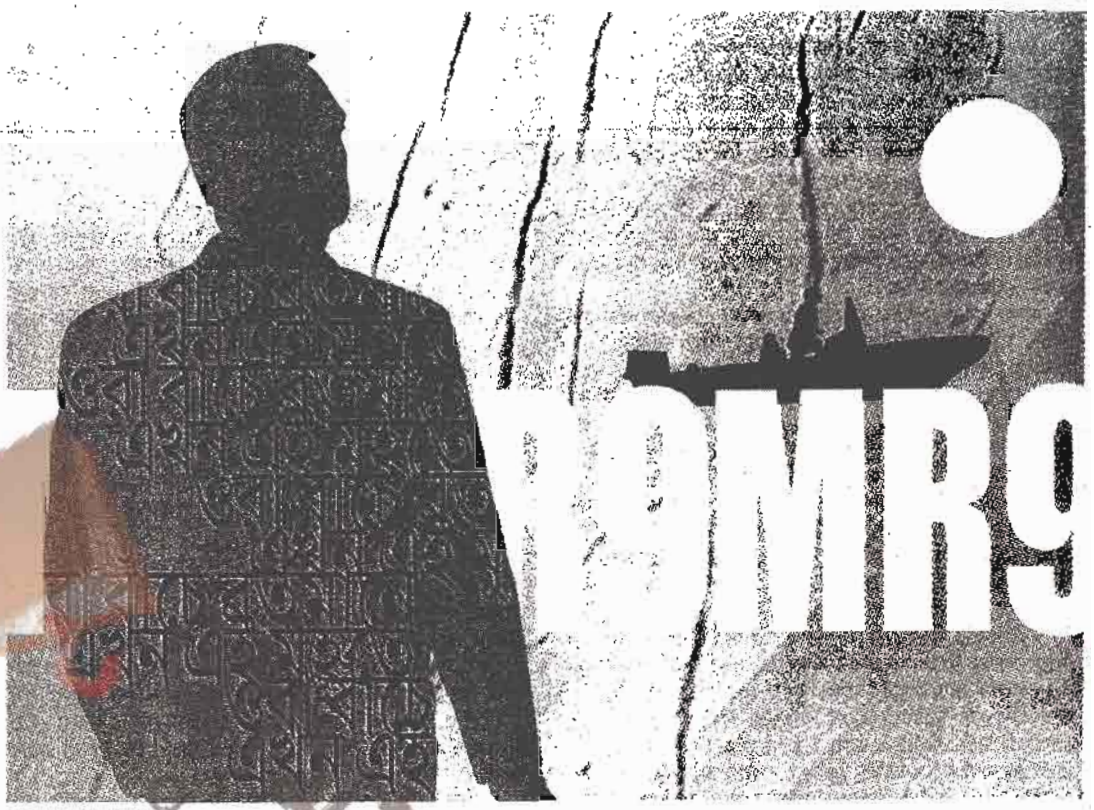

ওরা পাঁচে বর্তমানে

ভাও বুঝতে বুঝতে হারিয়ে ফেলেছে রানা ইয়টটাকে। সাবধানে স্পিড বাড়াল সোহানা। কিছুক্ষণ চলার পর আবার নেভিগেশন লাইট দেখতে পেল ও মাইল খানেক সামনে, কিছুটা ডানে।

কাছাকাছি গিয়ে ল্যান্ড করার জন্য তৈরি হয়ে নিল রানা। ফিট দুটো ফেলে দিয়ে হারনেস খুলে বার ধরে ঝুলে পড়ল দড়াবাজের মতো। অল্পক্ষণেই প্রায় ধরে ফেলল সোহানা মারলিনকে, এবার ওটাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যাবে এক পাশ দিয়ে। রানা সামান্য কাত হয়ে পোর্ট কোয়ার্টারের দিকে যাচ্ছে শুনে সোহানাও সেই অনুযায়ী বাঁক নিল, যাতে রানা যখন পেছনের ডেকে পৌঁছাবে, ঠিক তখন টো-রোপটা ইয়টের স্টার্ন ও পাওয়ারবোটের সঙ্গে এক লাইনে থাকে।

রানার কণ্ঠ ভেসে এল, 'আরেকটু আস্তে, সোহানা। আরও। ওপরে ভালো বাতাস আছে, তুমি দশ নটে নেমে যেতে পারো। গুড, এবার একটু ডান দিকে। হ্যাঁ, এইভাবে ধরে রাখো। নামছি...'

শরীরের ওজন ডানে চাপাল রানা, বাঁকা হয়ে নেমে আসছে ইয়টের পেছনে ডেকের দিকে। পঁচিশ ফুটে নেমে এসে টের পেল মারলিন এগিয়ে আছে কিছুটা, একটু বাঁয়েও সরতে হবে। 'থ্রটল, সোহানা। সামান্য। ঠিক আছে। ব্যস, আর না।'

ওপর থেকে ছোট্ট দেখাচ্ছিল আফটারডেক, কাছে এসে মস্ত লাগছে এখন। পেছনের রেইল টপকে ডেকের ওপর চলে এল ওর পা দুটো, এখনো বেশ অনেকটা ওপরে; এক্ষুনি নেমে না পড়লে স্টারবোর্ডের রেইল ডিঙিয়ে সাগরে গিয়ে পড়বে। শোধরানোর কোনো উপায় নেই। ঘুড়িটা একটু কাত করেই হাত ছেড়ে দিল ও বার থেকে, মুখে বলল, 'ওপরে, সোহানা!'

ঘুড়িটা চলে গেল ওপরে। শরীরটা প্রায় গোল করে দুটো ডিগবাজি খেয়ে উপুড় হয়ে থামল রানা সেলুনের দেয়াল ঘেঁষে। এক মিনিট চুপচাপ পড়ে রইল ওখানে, কান খাড়া করে শুনছে কোথাও কোনো শব্দ হয় কি না; কচ্ছপের মতো ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছে কোনো নড়াচড়ার আভাস পাওয়া যায় কি না। এবার মাইকটা কণ্ঠনালির সঙ্গে চেঁসে ধরে বলল, 'নখ কামড়ানো বন্ধ করতে বলো জেসিকাকে, পৌঁছে গেছি। তোমরা একটু দূরে সরে গিয়ে অপেক্ষা করো, আবার যোগাযোগ করতে আমার কিছুটা দেরি হতে পারে।'

ওয়েট-সুটের জিপ কিছুটা খুলে ক্লিপ দিয়ে আঁটা ট্রান্সমিটারের সুইচ অফ করে দিল রানা। খারাপ ল্যান্ডিংয়ের জন্য ডেকে ঘষা খেয়ে বাঁ গাল কিছুটা ছড়ে গেছে, হাত তুলে একটু আদর করে দিল জায়গাটা। বার কয়েক খুলে বন্ধ করে আঙুলগুলোর আড়ষ্টতা দূর করল। তারপর উরুতে বাঁধা নিওপ্রিনমোড়া একটা প্যাকেট খুলল। ওটার ভেতর থেকে বেরোল ওর প্রিয় ওয়ালথার পিপিকে, ছোট একটা বাক্সে হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ, কিছু ওষুধ, এক রোল সার্জিক্যাল টেপ আর ইথার ভরা একটা অ্যারোজল স্প্রে। উঠে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দ পায়ে সেলুনের কোণ ঘুরে এগোল ও সামনে।

আধমাইল বাঁয়ে, ইয়টের পাশাপাশি একই গতিতে চলছে পাওয়ারবোট, প্রায় নিঃশব্দে।

'আমরা কখন ইয়টে উঠব, সোহানা?' জানতে চাইল জেসিকা।

'রানা ডাকলেই যাব আমরা। এই ধরো, আর আধঘণ্টা। আগে ক্রুদের সামলাতে হবে। ওরা আছে মোট আটজন।'

'এত লোকের বিরুদ্ধে রানা একা! খুব কঠিন হবে না?'

'না-না। কঠিন ছিল ইয়টে পৌঁছানো। সেই কাজটা হয়ে গেছে। রিচি আর লুকাস থাকে ওপরের দুটো ডেক-কেবিনে; বাকি সবাই ঘুমায় নিচের হোল্ডে। ইয়টের কোথায় কী আছে, সব মুখস্থ রানার। সঙ্গে প্রত্যেকের জন্য উপহার নিয়ে গেছে ও—এক গজ করে প্লাস্টার, আর একটা বোতলে করে খানিকটা ক্লোরোফর্ম। ওতেই ঠান্ডা থাকবে ওরা।'

ছয়

ঘুম-জড়ানো চোখ মেলল রিচি হাওয়ার্ড। ওর কাঁধ ধরে কে যেন ঝাঁকাচ্ছে। খেঁকিয়ে উঠল সে, 'অ্যাঁই! কী হয়েছে? কোন শালা...'

ক্লিক করে শব্দ হলো মৃদু। বাতি জ্বলে উঠল কেবিনে। একটা থ্রিটু ক্যালিবারের ওয়ালথার পিপিকের নাকের সিঙ্গেল ফুটো চেয়ে রয়েছে ওর দিকে। চোখ মিটমিট করার পরও যেমন ছিল তেমনি রইল ওটা, মিলিয়ে গেল না। পিস্তলের ফুটো থেকে রিচির দৃষ্টি সরে পেছনে দাঁড়ানো কালো ওয়েট-সুট পরা লোকটার মুখের

ওপর স্থির হলো।

ধড়মড় করে উঠে বসতে যাচ্ছিল, নাকে-মুখে পিস্তলের গুঁতো খেয়ে শুয়ে পড়ল আবার। রানা! মাসুদ রানা দাঁড়িয়ে রয়েছে ওর সামনে পিস্তল হাতে। চেয়ে যে রয়েছে, চাখ দুটো যেন ঠান্ডা, নীলচে বরফের দুই টুকরো। কী ঘটছে এসব? বড়লোক সোহানার পেছন পেছন সারাক্ষণ খোদাই ষাঁড়ের মতো ঘোরে গুড ফর নাথিং ভাঁড়টা। ও এখানে কেন? এলই বা কী করে!

কয়েক সেকেন্ড বোঝার চেষ্টা করল রিচি কী ঘটছে, আরও কয়েক সেকেন্ড ব্যয় করল সে ওর মিথ্যার ঝুলি হাতড়ে; বুঝতে পারছে না ঠিক কী বলে নিস্তার পাবে। আস্তে করে বাঁ হাত বাড়াল একটা বোতামের দিকে।

মাথা নাড়ল রানা। নরম গলায় বলল, 'কোনো লাভ নেই, রিচি। হুইলের লোকটা ছাড়া বাকি সব কজন ঘুমিয়ে। বেল বাজিয়ে ঘুম ভাঙাতে পারবে না ওদের কারও। বারণ করা সত্ত্বেও যদি বোতামে আঙুল ছোঁয়াও, গুলি করে তোমার হাত ফুটো করে দেব আমি। সত্যিকারের গুলি, সেদিনকার মতো লুকাসের ছোড়া ফাঁকা গুলি না। ব্যাগে ভরা শুয়োরের রক্তের দরকার পড়বে না, কারণ প্রচুর রক্ত বেরোবে তোমার নিজের শরীর থেকেই।'

ওর চেহারা দেখে রানা বুঝতে পারল, ঘুমের ঘোর পুরোপুরি কেটে গেছে রিচির। প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিল তাড়াতাড়িই। চোখ সরু করে তাকাল সে রানার দিকে। কঠিন সুরে বলল, 'মস্ত বিপদে পড়েছ, মিস্টার মাসুদ রানা। টের পাচ্ছ? অন্যের ইয়টে অনুপ্রবেশ, জোরজুলুম, ডাকাতি...'

'নষ্ট করার সময় নেই আমার হাতে, রিচি,' বলল রানা। 'মন দিয়ে শোনো, প্লিজ। যা বলার একবারই বলব। আমি জানি, তুমি নও, লুকাস ম্যাকপিলই আসল বস। চেক করে দেখেছি, ও-ই ভাড়া নিয়েছে ইয়টটা। ওরই পরিকল্পনামাফিক ছিনতাই হয়। প্লেবয় হিসেবে তোমাকে রাখা হয়েছে সামনে। অভিনেতা। ঠিক একইভাবে ডাকাতি করেছ তোমরা স্পেরালডা, নিস এবং বন্দর ছাড়াও আরও কয়েক শহরে। তোমার মতো একইভাবে ফাঁকা গুলি খেয়ে মেঝেতে আছড়ে পড়েছিল অঘটন ঠেকানোর জন্য দাঁড় করিয়ে রাখা লোকটা, কারও সাহস হয়নি বাধা দেওয়ার।' এই পর্যন্ত বলে থামল রানা। খাটের পাশে রাখা একটা লকারের ওপর বসল। পিস্তলটা স্থির রয়েছে রিচির পেট বরাবর।

'এবার কিছুটা অনুমান করব। স্পেরালডার পুনরাবৃত্তি করার খায়েশ হলো লুকাসের, তোমাকে বলল বন্দরের সবাইকে দাওয়াত করতে। ভয় পেলে তুমি। রিচি হাওয়ার্ডের পার্টিতে দ্বিতীয়বার ডাকাতি হলে কারও মনে সন্দেহ জাগতে পারে। অনেক কাকুতি-মিনতি করলে, কিন্তু তোমার আপত্তিতে কান দিল না লুকাস, লোভে অন্ধ হয়ে গেছে সে তখন। কেটে পড়ার সাহস নেই তোমার, সে জন্যই ওকে খুন করার প্ল্যান করেছিলে তুমি সেদিন বোলেদর রেস্তোরাঁর কার পার্কে। ওই দুই গুন্ডাকে নিয়োগ করেছিলে তুমিই। কিন্তু কিছু না জেনে প্রফেসর আদনান মুক্তফি বাঁচিয়ে দিল ব্যাটাকে। ফলে দ্বিতীয়বার একই কায়দায় ডাকাতির আয়োজন বাতিল করা গেল না।'

একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে রানা রিচির চোখের দিকে। ওর চেহারা দেখেই অনুমানের সত্যতা টের পেল। কপালের চিকন ঘাম এখন ফোঁটায় ফোঁটায় নামছে গাল বেয়ে।

'পুলিশকে খবর দিলাম আমি, তোমার মুখ শুকিয়ে গেল। তোমার ভয়, ধরা পড়লে মুখ খুলতে পারে দুই গুন্ডা পুলিশের কাছে; আর তা হলে বারোটা বাজাবে তোমার লুকাস ম্যাকপিল। কাজেই ক্লাউনের ভূমিকায় নামতে হলো তোমাকে—আমরা সরে যেতেই রিভলবারটা হাত থেকে ফেলে পালানোর সুযোগ করে দিলে ওদের। তোমার ওই গল্পো সোহানা বা আমি কেউই বিশ্বাস করিনি। তারপর যখন দেখলাম, আবার সেই সাগরপারের পার্টি থেকে একই কায়দায় ছিনতাই হচ্ছে, তোমার হাতের মাংস ফুটো করে বুলেট বেরিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আর কারও গায়ে লাগছে না, জখমটা দেখাতে তোমার মহা আপত্তি—তখন বুঝতে কিছুই বাকি থাকল না আর।'

রিচির গলা শুকিয়ে কাঠ, তার পরও বলল, 'প্রমাণ করতে পারবে এসব? কোর্টে দাঁড়িয়ে?'

'প্রমাণ করতে যাবই না,' বলল রানা, 'লুকাস তোমার দোস্তো নয়, বস। যমের মতো ভয় পাও তুমি ওকে। আমি যদি ওকে শুধু বলি, তুমিই ওকে খুন করার ব্যবস্থা করেছিলে; ও কি কোনো প্রমাণ চাইবে? আমার প্রমাণ করতে হবে না, রিচি, ও নিজেই বুঝে নেবে কেন কী ঘটেছিল।'

মনে হলো কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেল রিচি। ভয়ে কুঁচকে গেছে চেহারাটা। মেনে নিয়েছে পরাজয়। বলল, 'বিনিময়ে তুমি যদি কিছু চাও, আমি রাজি। কী চাও তুমি, মাসুদ রানা?'

'একটু সহযোগিতা, রিচি,' বলল রানা, 'সেই সঙ্গে লুটের মাল, অবশ্যই।'

সাগরের দোলায় দুলছে ইয়ট। ইঞ্জিন বন্ধ।

হুইলহাউসের লোকটা ঘুমাচ্ছে বেঘোরে। সার্জিক্যাল টেপ দিয়ে হাত দুটো বাঁধা, পা বাঁধা নাইলনের দড়ি দিয়ে। পাওয়ারবোট এখন সেঁটে আছে ইয়টের গায়ে, রানা গ্যাংওয়ে নামিয়ে দিতেই উঠে এসেছে সোহানা, আদনান ও জেসিকাকে নিয়ে। সোহানা এগিয়ে এসে রানার গালটা পরীক্ষা করল, কিন্তু মুখে কিছু বলল না।

রানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে রিচি হাওয়ার্ড।

'ভাগ্যিস জেসিকাকে সঙ্গে এনেছিলাম,' বলল রানা, 'তা নইলে আমাদের সব খাটনি আজ বরবাদ হয়ে যেত।'

'লুটের মাল কি ইয়টে?' জানতে চাইলেন আদনান।

'হ্যাঁ। কিন্তু ভজকট করে ফেলেছি, আদনান ভাই।' বিরক্ত কণ্ঠে বলল রানা।

'কী রকম?'

'এখন দেখছি নাটের গুরু আসলে লুকাস, এইটা,' বুড়ো আঙুল দিয়ে রিচিকে দেখাল রানা, 'ওর ভেড়া। এদের কাউকে বিশ্বাস করে না লুকাস, একমাত্র ও-ই জানে কোথায় রাখা আছে লুটের মাল। আমি এ ব্যাটাকে সর্দার মনে করে আগেই অজ্ঞান করে দিয়েছি লুকাসকে ইঞ্জেকশন দিয়ে। একটানা কয়েক ঘন্টা ঘুমাবে ও, কিন্তু অত সময় আমাদের হাতে নেই। অবশ্য জেগে থাকলেও ওর কাছ থেকে কথা আদায় করা যেত কি না সন্দেহ আছে।'

'তাহলে কি চোরের ওপর বাটপারি করতে এসে খালি হাতে ফিরতে হবে আমাদের?' হতাশ কণ্ঠে জানতে চাইলেন প্রফেসর।

'না, আমাদের সঙ্গে জেসিকা আছে না? সবকিছু নির্ভর করছে এখন জেসিকার ওপর। গোটা ইয়ট সার্চ করতে হলে পুরো এক সপ্তাহ লেগে যাবে—অথচ আর একটা ঘন্টাও এখানে থাকা আমাদের জন্য নিরাপদ নয়।' জেসিকার দিকে ফিরল এবার রানা, 'এখন কাজে লেগে যাও, জেসিকা। তুমি যদি লুটের মাল খুঁজে না পাও, বিফল হয়ে ফিরতে হবে আমাদের।'

হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল জেসিকার মুখ, ভেজা কপাল থেকে পানির কণা মুছল হাতের পোঁছায়। আনন্দ গোপন করতে জানে না ও। হাসছে খিলখিল করে। এত আনন্দ, এত খুশি ওর মধ্যে খুব কমই দেখেছেন আদনান।

'অনেক সোনা ছিল ওখানে,' বলল জেসিকা, 'কাজেই আমার খুঁজে পাওয়া উচিত। কিন্তু দুটো তামার রড বা টিউব লাগবে যে।'

'আমি একটা আর্থিংয়ের তার পেয়েছি স্টোরে, দেখো তো এতে কাজ হবে কি না?' বলে দুই সুতা ব্যাসের আড়াই ফুট লম্বা এক টুকরো তামার তার বাড়িয়ে ধরল রানা।

ওটা হাতে নিয়ে জেসিকা বলল, 'এটাকে দুই ভাগ করে দিতে পারলে সুবিধে হতো।'

'এক্ষুনি অর্ধেক করে দিচ্ছি,' বলে পকেট থেকে চার ফলার একটা সুইস অফিসার্স নাইফ বের করল রানা।

'কিছুটা ছোট-বড় রেখো,' বলল জেসিকা।

প্রথমে ছুরি দিয়ে চেষ্টা করে হলো না যখন, রেত ও করাতের ফলা চালিয়ে দুই খণ্ড করে ফেলল রানা তারটাকে। একটা খণ্ড সতেরো ইঞ্চি, অপরটা তেরো।

স্টারবোর্ড রেইলের কিনার থেকে শুরু করল জেসিকা। ধীর পায়ে এগোচ্ছে। দুই হাত সামনে বাড়ানো, তামার তার দুটোও সামনের দিকে তাক করা। কী হয় দেখবে বলে উদগ্র আগ্রহ নিয়ে সবাই চলেছে ওর পেছন পেছন। ওর এই অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার কথা অনেক দিন আগে শুনেছে রানা সোহানার কাছে। কয়েকটা গোল্ড-মাইন প্রসপেক্টর কোম্পানির হয়ে চুক্তি ভিত্তিতে কাজও করেছে জেসিকা বিয়ের আগে।

তিন-চার ফুট সরে সরে লম্বালম্বিভাবে দুবার আসা-যাওয়ার পর তৃতীয়বার ইয়টের মাঝামাঝি এসে জেসিকার হাতের তার দুটো সরে গিয়ে গুণ-চিহ্নের আকৃতি নিল। থেমে দাঁড়াল ও। চেহারায় গভীর মনোনিবেশের ছাপ। সামান্য ডানে সরে পা ঠুকল

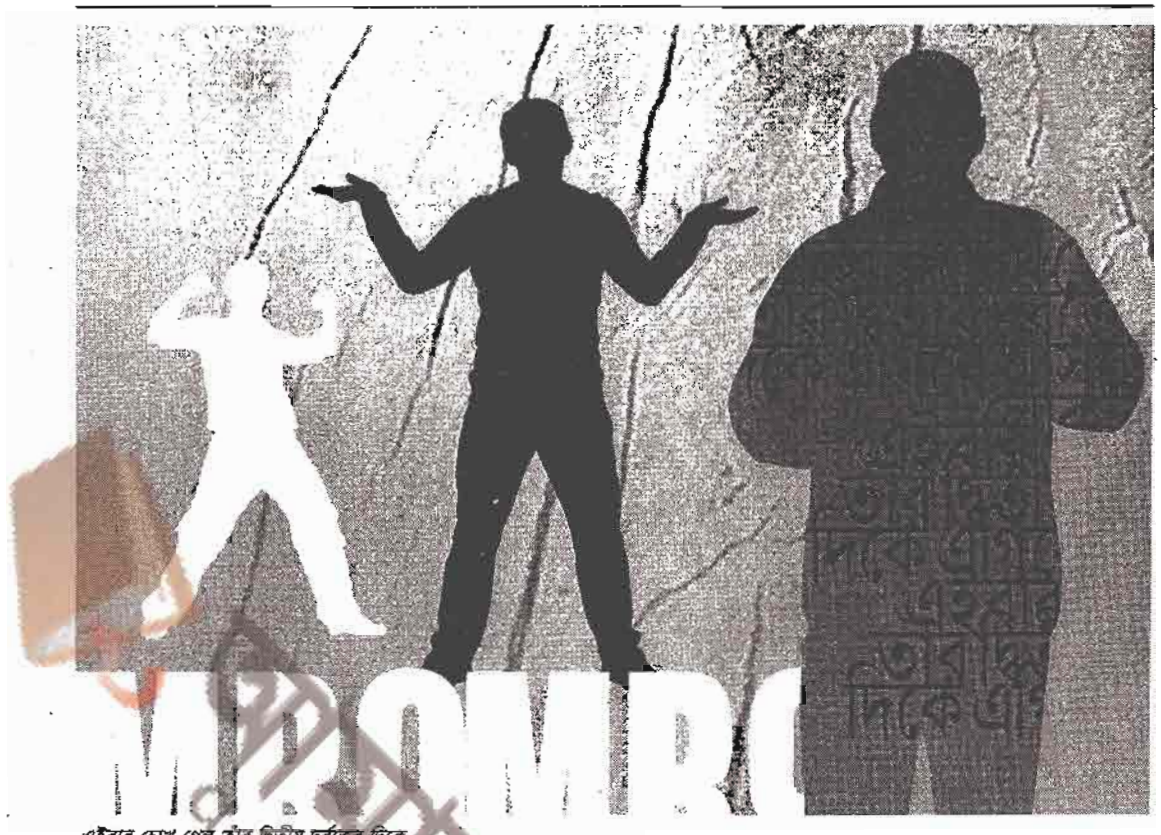

এইবার চোখ গেল তাঁর দ্বিতীয় দুর্বৃত্তের দিকে

ও ডেকের ওপর।

'এইখানে, রানা। দশ ফুট নিচে। একটু কমও হতে পারে।'

'এর নিচে কী, রানা?' জিজ্ঞেস করল সোহানা।

'চলো, দেখি।'

প্রফেসরকে একটু পর পর ডেকের ওই জায়গাটায় জুতো দিয়ে শব্দ করতে বলে বাকি সবাই নেমে গেল নিচে। দেখা গেল, ওখানে একটা বাল্কহেড। পার্টিশনের একপাশে এয়ারকন্ডিশনিং ইউনিট, অন্য পাশে পেইন্ট স্টোর ও ওয়ার্কশপ। খুব ধীরে এক ইঞ্চি দু ইঞ্চি করে এগোচ্ছে এখন জেসিকা। আবার গুপ্ত-চিহ্ন তৈরি করল তামার তার। বাল্কহেডের সামনে গিয়ে দাঁড়াল জেসিকা।

'এইখানে,' বলল সে, 'ডেক লেভেলে।'

'বাল্কহেডের নিচের দিকে একটা ভেন্টিলেটার গ্রিড দেখা যাচ্ছে,' বলল সোহানা, 'তোমার পায়ের কাছে। রানা, দেখো তো, একটা স্ক্রু ড্রাইভার পাওয়া যায় কি না।'

ইতিমধ্যে নেমে এসেছেন প্রফেসর। চটপট চারটে স্ক্রু খুলে ফেললেন তিনি। গ্রিড সরিয়ে হাত বাড়িয়ে শাফটের ভেতর থেকে চামড়ার একটা ব্যাগ বের করে আনলেন। ওর ভেতর তুলো দিয়ে মুড়ে ধরে থরে সাজিয়ে রাখা আছে লুট করা অলংকারগুলো। 'বের করে ফেলেছ, ডার্লিং!' বললেন তিনি নিচু, কাঁপা গলায়।

জেসিকার গাল দুটো কুঁচকে গেল, পানি এসে গেল চোখে। কিন্তু এ কান্না আনন্দের। এক হাতে ওকে জড়িয়ে ধরে হা হা করে হেসে উঠলেন প্রফেসর প্রাণখোলা হাসি।

ব্যাগের ভেতরটা নেড়েচেড়ে দেখল সোহানা। একনজরেই অনেকগুলো অলংকার চিনতে পারল ও। মাথা ঝাঁকাল রানার দিকে চেয়ে।

'এবার কী, রানা?' চট করে ওর হাতে ধরা পিস্তলটার দিকে একবার চেয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করল রিচি হাওয়ার্ড।

'তোমার কেবিন,' বলল রানা। ইশারা করল পিস্তল দিয়ে। 'আমরা চলে যাচ্ছি এখন। তুমি চাইলে লুকাসকে যেমন দিয়েছি, তেমনি এক ডোজ বারবিচুরেট পুশ করতে পারি তোমার শরীরে। আটজনের মধ্যে কেউ না কেউ জেগে উঠে মোচড়ামুচড়ি করে খুলে ফেলবে বাঁধন, তারপর মুক্ত করবে বাকি সবাইকে। সেটাই বোধহয় কিছুটা নিরাপদ হবে তোমার জন্য, কী বলো?'

মাথা ঝাঁকাল রিচি। এগোল দরজার দিকে।

সাত

পনেরো মিনিটের মধ্যেই আকাশের গায়ে মারলিনের সিলুয়েট আবছা হতে হতে মিলিয়ে গেল। পাওয়ারবোটের হুইল আবার সোহানার হাতে। দুলন্ত ভূমধ্যসাগরের পিঠ চিরে দিয়ে তীরবেগে ছুটছে ওদের বোট উত্তর-পশ্চিম বরাবর। হুড খুলে ফেলেছে সোহানা। বাতাসে উড়ছে ওর দীর্ঘ চুল। ওয়েট-সুট পাল্টে লকার থেকে গরম কাপড় বের করে পরেছে রানা। মস্ত বড় একটা হাই তুলে সিটের পেছনটা নামিয়ে দিয়ে এখন শোয়ার তাল করছে।

'মনে হচ্ছে, স্বপ্নের মধ্যে আছি!' বললেন আদনান, 'সুখস্বপ্ন। আজই কি লুটের মাল তুলে দেবে পুলিশের হাতে?'

'নাহ্!' জবাব দিল সোহানা, 'পুলিশের ধারেকাছেও যাব না।'

'তাহলে? ওদের শাস্তি হবে না?' জানতে চাইল জেসিকা।

'শাস্তি শুরু হয়ে যাবে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই। খোয়া গেছে লুটের মাল, কিন্তু কেউ জানে না কীভাবে, এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। রিচি ছাড়া সবাই মনে করবে ওদেরই ভেতর কেউ করেছে কাজটা। কিন্তু কাউকে দিয়ে স্বীকার করানো যাবে না কার কাজ। কেউ কারও কথা বিশ্বাস করবে না, সবাই সন্দেহ করবে সবাইকে, ফলে ভেঙে যাবে দল। আমরা মাঝ-সাগরে চড়াও হয়ে নিয়ে এসেছি ব্যাগ, এই গল্প লুকাস ম্যাকফিলকে শোনানোর সাহস হবে না রিচির।' একটা হাই তুলল সোহানা, তারপর বলল, 'তোমরা একটু গড়িয়ে নাও। সবাই মিলে রাত জাগার কোনো মানে হয় না।'

'ঠিক বলেছ,' বললেন আদনান, 'কিন্তু মনের মধ্যে নানান প্রশ্ন ঘুরপাক খেলে ঘুম আসবে কী করে, ওনি?'

'কী প্রশ্ন, আদনান ভাই?'

'পুলিশের কাছে যাবে না বলছ, তাহলে এই অলংকারগুলোর কী হবে? মালিকেরা তাদের জিনিস ফেরত পাবে না?'

'নিশ্চয়ই পাবে। শোনো, দু-চার দিন পর তুমি আর জেসিকা এই ব্যাগটা খুঁজে পাবে, ধরো, কোনো সাগরসৈকতে। এমন এক জায়গায় পাবে, যেখানে প্রচুর লোকজন আছে; আর এমন এক সময়ে, যখন ধনী ক্লায়েন্টদের চাপাচাপিতে ইনশিওরেন্স কোম্পানিগুলো সবাই মিলে ওগুলোর উদ্ধারকারীকে অন্তত এক

লাখ ডলার পুরস্কার দেবে বলে ঘোষণা করবে। এবার ক্লিয়ার?'

'কিসের ক্লিয়ার? আরও তো এলোমেলো হয়ে গেল সব! দাঁড়াও। আগে শুনি, এর মধ্যে পুরস্কার আসছে কী করে?'

'দেয় সবাই। অন্তত দশ পার্সেন্ট তো দিতেই হবে। তা না হলে আমরা ওগুলো ফেরত দিতে দেরি করব।'

'বুঝলাম, ব্ল্যাকমেইলিং। এবার শোনা যাক, লোকজন থাকতে হবে কেন?'

'ওরা সাক্ষ্য দেবে, সত্যি তোমরা ব্যাগটা বালির নিচ থেকে খুঁড়ে তুলেছ। তোমাদের হইচই শুনে ভিড় করে ঘিরে ধরবে মানুষ, ছবি তুলবে মুহুর্মুহু। যাদের মাল খোয়া গেছে, তারা ছুটে আসবে; সাংবাদিক এসে ছেঁকে ধরবে, বিমা কোম্পানিগুলো আসবে, পুলিশ আসবে—রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে যাবে তোমরা। তারপর পুরস্কারের ট্যাক্স-ফ্রি এক লাখ ডলার পকেটে পুরে হাসতে হাসতে চলে যাবে লন্ডন।'

'অ্যাঁ?' শুয়ে পড়তে যাচ্ছিল জেসিকা, লাফিয়ে উঠে বসল। 'পুরস্কারের টাকা আমাদের পকেটে আসবে কেন?'

'তাহলে কার পকেটে যাবে, শুনি?' পাল্টা প্রশ্ন করল সোহানা। তারপর ব্যাখ্যা করল, 'তুমি লুকাসকে চিনিয়ে দাওনি? তুমিই লুটের মাল খুঁজে বের করোনি? যা বলছি, সত্যি কি না? তোমাকে ছাড়া কোনো দিনই পেতাম না আমরা অলংকার। ওদের বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ না থাকায় আজকের অ্যাডভেঞ্চারের ফলে ওরা আইনের আশ্রয় নিলে মস্ত বিপদে পড়তে পারতাম আমরা। তাই না, রানা?'

কোনো জবাব নেই। আরে! ঘুমিয়ে পড়ল নাকি মানুষটা!

সামনে ঝুঁকে ভালো করে দেখলেন আদনান রানার মুখটা। 'হায়, খোদা! বেঘোরে ঘুমাচ্ছে! মানুষ, না পিশাচ?' আগেও ঘুমন্ত রানাকে দেখেছেন তিনি। ঘুমালে ওর মুখটা শিশুর মতো হয়ে যায়। আজ আরও বাচ্চা দেখাচ্ছে। এলোমেলো চুল, গালে ছড়ে যাওয়ার দাগ; শুয়ে আছে, ঠিক যেন ক্লান্ত এক পথকলি। পরিষ্কার বুঝতে পারছেন, জেসিকা আজ বাজারে গিয়ে লুকাসকে চিনতে পেরেছে শুনেই ওঁদের পুরস্কার পাইয়ে দেওয়ার প্ল্যান তৈরি করে ফেলেছিল রানা। আশ্চর্য একটা মমতা বোধ করলেন তিনি মহৎপ্রাণ এই মানুষটার প্রতি।

'বেশ, বুঝলাম, জেসিকা খুঁজে বের করেছে জুয়েলারির ব্যাগ। কিন্তু রানা আমাদের নিয়ে গিয়েছিল। নিজের ঘাড় মটকানোর ঝুঁকি নিয়ে ঘুড়িতে করে নেমেছে ডেকে।'

কাঁধ ঝাঁকাল সোহানা। 'তা ঠিক। মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়েছিল ও। যদি সাহস থাকে তবে পুরস্কারের অর্ধেক টাকা ওকে দেখে দেখতে পারো। আমার বিশ্বাস, সেইটাই হবে তোমাদের শেষ দেখা।'

তিন দিন পর প্রফেসর আদনান মুস্তফি স্ত্রীকে নিয়ে একদল টুরিস্টের সঙ্গে একটা ট্রাভেল এজেন্সির আয়োজন করা এক্সকার্শনে গেলেন সাঁ মিগুয়েল বিচে। বেলা এগারোটার দিকে বিচে পড়ে থাকা একটা পাথরে হেলান দিয়ে বসিয়ে স্ত্রীর ছবি তুলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় চেঁচিয়ে উঠল জেসিকা, 'আরে! এটা কী! সাপ নাকি?'

উপস্থিত সবার চোখ ঘুরে গেল অন্ধ মেয়েটির দিকে। ও তখন একটা দড়ি ধরে টানছে। দেখা গেল, পাথরের একটা বালি আর আলগা নুড়িভর্তি খাঁজে দুই ফুটের মতো চলে গেছে দড়িটা। সেটার শেষ মাথায় বাঁধা একটা চামড়ার ব্যাগ বেরিয়ে এল বাইরে।

ওর ভেতর কী আছে দেখার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়ল সবাই। যখন দামি সব গয়না বেরোতে শুরু করল, হুলুস্থুল পড়ে গেল চারপাশে। মোবাইলে খবর দিচ্ছে সবাই এদিক-ওদিক। কেন ডাকাতেরা কদিন আগে লুট করা মাল এইখানে এনে লুকিয়ে রাখল, তাই নিয়ে নানান জনে নানান মতামত দিচ্ছে।

ভন্ডুল হয়ে গেল এক্সকার্শন। সবাই মিলে ব্যাগ নিয়ে হাজির হলো গিয়ে পুলিশ-স্টেশনে।

ঠিক সেই সময়ে ভিলার বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে রোদ পোহাচ্ছে রানা, হাতে পেপার। সপাৎ সপাৎ স্যান্ডেলের আওয়াজ কানে আসতেই ঘাড় ফিরিয়ে চাইল।

উজ্জ্বল কমলা রঙের সুইম-সুট পরেছে সোহানা, চুলগুলো ঘাড়ের পেছনে বাঁধা। সাঁতার কাটবে সাগরে। রানাকে কোমরের ধাক্কায় এক পাশে সরিয়ে দিয়ে নিজের জন্য জায়গা বের করে নিল সোহানা। একটু বাঁকা হয়ে মুখোমুখি হলো রানার। ওর দুই কাঁধে হাত রেখে অদ্ভুত দৃষ্টিতে চাইল রানার মুখের দিকে। কী যেন বলতে চায়, কিন্তু দ্বিধা করছে।

আরও একটু সরে সোহানাকে আরাম করে বসার জায়গা করে দিল রানা। সোহানা বলল, 'এক লাখ ডলারে আদনান ভাই আর জেসিকা ধারদেনা শোধ করে সিধে হয়ে দাঁড়াতে পারবে আবার। তার পরও আরও কিছু থেকে যাবে হাতে।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। একটু পর আবার বলল সোহানা, 'তোমাকে একটা প্রশ্ন করব, কিছু মনে করবে?'

হাসল রানা। 'কবে কী মনে করেছি?'

'কদিন ধরে ভাবছি, তুমি আমাকে কিছুই বলোনি কেন। তুমি জানতে, ওই রাতে ডাকাতি হবে, কারা করবে তাও জানতে, তাই না?'

সোহানার চোখে চোখ রাখল রানা, 'তুমি টের পাওনি?'

'জেসিকা লুকাসের গন্ধ পাওয়ার আগে বুঝিনি। সেদিন বুঝলাম, ওটা তোমার জন্য নতুন কোনো খবর ছিল না। তখনই মনে হলো, তুমি আগে থেকেই সন্দেহ করেছিলে ওদের।'

'সেই রাতে বোলেদর রেস্তোরাঁয় যা যা ঘটেছে, এভাবে ছাড়া আর কোনোভাবে মিলছিল না,' বলল রানা, 'হ্যাঁ, আমি জানতাম পার্টিতে ছিনতাই হবে। ভেবেছিলাম, দু-চার দিন অপেক্ষা করে প্রমাণ করে দেব, এ জন্য দায়ী রিচি গং। ভাবছিলাম, প্রমাণটা জেসিকা আর আদনান ভাইকে দিয়ে কী করে করানো সম্ভব। কিন্তু জেসিকা লুকাসকে চিনে ফেলায় ক্রেডিটটা ওর ওপর চাপানো সহজ হয়ে গেল। মারলিন যে কবে কখন পাড়ি দেবে সাগরে, তাও জানা ছিল আমার, তাই আদনান ভাইকে পাঠিয়েছিলাম স্বচক্ষে সেটা দেখে আসতে।'

মৃদু হাসল সোহানা। 'সে জন্যই পাওয়ারবোটে যা যা প্রয়োজন সব রেডি করে রেখেছিলে আগে থেকে।'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'রিচি জানত কোথায় ব্যাগটা আছে, তাই না?'

আবার মাথা ঝাঁকাল ও। 'এটাও বুঝে ফেলেছ?'

'লুকাসকে কয়েক ঘণ্টার জন্য ঘুম পাড়িয়ে রাখতে হয়েছে তোমার জেসিকাকে ওগুলো আবিষ্কারের সুযোগ দেওয়ার জন্য। ঠিক?'

'হ্যাঁ। রিচি জানত লুকাসের কেবিনে লকারে রাখা আছে লুটের মাল। আমার খুঁজতে হয়নি। যখন বলেছি দুই গুন্ডা ভাড়া করে লুকাসকে চিরতরে সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনার কথাটা আমার জানা আছে, লুকাসও জানবে সহযোগিতা না করলে, তখন সুড়সুড় করে আমাকে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে জায়গাটা।'

'তাহলে তুমিই ওটা নিয়ে গিয়ে গ্রিডের ভেতর শাফটে রেখেছিলে জেসিকাকে দিয়ে আবিষ্কার করাবে বলে?'

ভুরু কুঁচকে গেল রানার। 'সবই তুমি জানো, সোহানা। সে কথা আমাকে বলোনি কেন? এ কটা দিন শুধু শুধুই আমি অপরাধবোধে ভুগলাম!'

অবাক হলো সোহানা। 'বা রে, তুমি আমাকে বলোনি বলেই আমিও কিছু বলিনি। ডাকাতির ব্যাপারে আমি শিশুর ছিলাম না, কিন্তু যদি হয়, তাহলে পুরস্কারের পরিমাণ যেন বাড়ে, সে জন্যই তোমার দেওয়া মালাটা আমি হাতছাড়া করেছিলাম। এখন বুঝতে পারছি, তুমি আমার উদ্দেশ্য টের পেয়েছিলে বলেই চট করে রাজি হয়েছিলে মালাটা জেসিকাকে পরানোর ব্যাপারে।' মাথাটা একটু নিচু করল সোহানা, 'তবে একটা সত্য কথা তোমাকে বলি : যখন ওটা লুট হয়ে গেল, তখন আমার কলজেটা ফেটে যেতে চাইছিল। কী কষ্ট করে তুলেছিলে তুমি ওগুলো ডুব দিয়ে দিয়ে! ওটা আমি ফিরে না-ও পেতে পারতাম!'

টপটপ দু ফোঁটা পানি পড়ল সোহানার চোখ থেকে। পানিটা মুছিয়ে দিয়ে ওর গালে চুমো দিল রানা। হাসছে ওর দুষ্টামির হাসি।

'ওগুলো তো শুধুই মুক্তা, সোহানা। তোমার জন্য তুলেছিলাম, তুমি কত খুশি হবে ভেবে মনের আনন্দে একটা একটা করে সংগ্রহ করেছিলাম। ওগুলো যদি কোনো দিন চুরি হয়ে যায়ও, আমার আনন্দটুকু থাকবে চিরকাল—কেউ কোনো দিন চুরি করতে পারবে না।'

এবার ঝাঁপিয়ে পড়ল সোহানা রানার বুকে। হাউমাউ করে কাঁদছে। ●

বিদেশি কাহিনির ছায়া অবলম্বনে